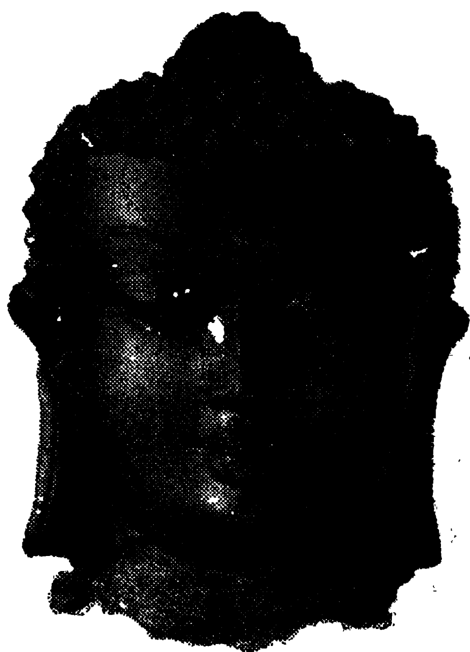


ধম্মপদ-পরিচয়

প্রবোধচন্দ্র সেন

ধম্মপদ-পরিচয়

প্রবোধচন্দ্র সেন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৬০ শ্রাবণ

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য
শৈলেন প্রেস। ৪ সিমলা স্ট্রীট্। কলিকাতা

৩ · ১

নিবেদন

বর্তমান পুস্তকের দুটি বিভাগ, ধম্মপদ-পরিচয় ও ধম্মপদ-প্রচয়। ‘ধম্মপদ’ (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৫ শ্রাবণ-আশ্বিন) এবং ‘ধম্মপদ ও ভারতীয় সংস্কৃতি’ (পূর্বাশা, ১৩৫৫ কার্তিক) নামে পূর্বপ্রকাশিত দুটি প্রবন্ধকে নূতনভাবে সাজিয়ে ও প্রয়োজনমতো স্থানে স্থানে কোনো কোনো অংশ সংযোজন করে ধম্মপদ-পরিচয় বিভাগ সংগঠিত হল। ধম্মপদ-প্রচয় বিভাগটি নূতন লেখা। এই বিভাগের মূল পালি পাঠ প্রচয়ন ও তার অনুবাদ করার সময় মুখ্যতঃ নির্ভর করেছি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, চারুচন্দ্র বসু, স্বামী হরিহরানন্দ, ভি. শী[illegible] এবং অধ্যাপক এন কে ভগবৎ (বম্বে বুদ্ধ সোসাইটি) -সম্পাদিত ধম্মপদ-গ্রন্থসমূহের উপরে। তা ছাড়া হার্ভার্ড ওরিএণ্টাল গ্রন্থমালার ২৮-৩০ সংখ্যক গ্রন্থ (পালি ধম্মপদ-অট্‌ঠকথার ইংরেজি অনুবাদ) থেকেও যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছি।

এই পুস্তক রচনা ও প্রকাশে সুহৃত্তম শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীসুশীল রায়ের পরামর্শ ও সহায়তা পেয়ে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ১০ শ্রাবণ ১৩৬০

প্রবোধচন্দ্র সেন

অধ্যায়সূচি

॥ প্রচ্ছদপট ॥

বুদ্ধ। কষ্টিপাথর। খৃ একাদশ শতক। বিক্রমপুর, ঢাকা
শ্রীসরসীকুমার সরস্বতীর সংগ্রহ

॥ মলাট, পৃ ৪ ॥

ধর্মচক্র-ফলক। প্রস্তর। খৃ ষষ্ঠ শতক। প্রপতোম, থাইল্যাণ্ড

নির্বাণগতা মাতৃদেবীর উদ্দেশে স্মৃতিতর্পণ

॥ ধর্মচক্রপ্রবর্তন-তিথি, ২৪৯৭ বুদ্ধাব্দ ॥

১

ভারতবর্ষের ত্রিরত্ন

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বাহন বলে যে কয়খানি গ্রন্থ আধুনিক কালে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে, তার মধ্যে চতুর্বেদ ত্রিপিটক মহাভারত রামায়ণ মনুসংহিতা এবং কালিদাসের মেঘদূত ও শকুন্তলা এই কয়খানিই প্রধান। এগুলির মধ্যে প্রথম তিনখানি একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এই তিনখানিকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির তিনখানি বিশ্বকোষ বলে গণ্য করা যায়। বেদ ত্রিপিটক ও মহাভারতের বিপুল সংস্কৃতি-মণ্ডলের উজ্জ্বলতম প্রকাশ ও পরিণতি ঘটেছে তিনটি সংহত কেন্দ্রে। ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির এই তিনটি প্রকাশকেন্দ্র হচ্ছে যথাক্রমে উপনিষদ্ ধম্মপদ ও ভগবদ্‌গীতা। ভারতীয় চিত্তের অভিবর্তনের আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা প্রাচীন কাল হইতেই দেখিয়াছি, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে; ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ্—তাহার উপনিষদ্, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম, সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী।

—ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা, পরিচয়

বৌদ্ধধর্মের পূর্ণতম ও সংহততম প্রকাশ ঘটেছে ধম্মপদ গ্রন্থে। সুতরাং উপনিষদ্ গীতা ও ধম্মপদকেই জড়ত্বের বিরুদ্ধে ভারতীয় চিৎশক্তির জয়লব্ধ শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বলে স্বীকার করে নিতে পারি।

সমগ্র বৈদিক যুগব্যাপী চিত্তমন্থনের ফলে যে অমৃত উত্থিত হয়েছিল তার পরিচয় পাই বারোখানি উপনিষদ্ গ্রন্থে। আর, মহাভারতীয় সংস্কৃতির জগতে গীতার স্থাননির্ণয়প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

আতসকাচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আরএক পিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি এক দিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আরএক দিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি, —সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্গীতা।·· ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতত্ত্বকে দেখিয়াছিল।·· মানুষের সকল চেষ্টাই কোন্‌খানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে, মহাভারত সকল পথের মাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে,—তাহাই গীতা।·· ভারতচিত্তের সমস্ত প্রয়াসকেই এক মূলসত্যের মধ্যে এক করিয়া দেখাই মহাভারতের দেখা। তাই মহাভারতের এই গীতার মধ্যে লজিকের ঐক্য-তত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের ঐক্যতত্ত্ব আছে। —ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা, পরিচয়

বিশাল মহাভারতে গীতার যে স্থান, বিপুল ত্রিপিটক-সাহিত্যে ধম্মপদেরও সেই স্থান। এই প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্‌ধৃত করি।—

ভগবদ্গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন এক স্থানে একটি সংহতমূর্তি দান করিয়াছেন, ধম্মপদং গ্রন্থেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে। —ধম্মপদং, ভারতবর্ষ

বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও অনুরূপ উক্তি করেছেন।—

আমরা শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার যেরূপ সমাদর করি, বৌদ্ধগণ ধম্মপদ গ্রন্থেরও তদ্রূপ সমাদর করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সকল ধর্মের সারস্বরূপ গীতোক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, বুদ্ধ তথাগতও সেইরূপ ধম্মপদ গ্রন্থে স্বীয় ধর্মের স্থূলমর্ম্ম সংক্ষিপ্তভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। —ভূমিকা (প্রথম সং), চারুচন্দ্র বসু-সম্পাদিত ধম্মপদ

২

ত্রিরত্নের কালক্রম

উপনিষদ্ ধম্মপদ ও গীতা এই তিনটিই ভারতীয় সংস্কৃতির মুখ্যতম প্রতীক। সুতরাং ওই সংস্কৃতির ইতিহাসে ধম্মপদের স্থান নির্ণয় করতে হলে উপনিষদ্ ও গীতার সঙ্গে তার সম্বন্ধ বিচার প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অত্যাবশ্যক কাজটি এখন পর্যন্ত যথোচিতভাবে সম্পন্ন হয়নি। এই ভারতীয় ত্রিরত্নের পারস্পরিক সম্বন্ধনির্ণয়ের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাদের ঐতিহাসিক কালক্রম এবং তৎকালীন সংস্কৃতিগত পরিবেশ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ। বর্তমান পুস্তকে সে আলোচনা সম্ভব নয়। ধম্মপদ গ্রন্থের পরিচয়প্রসঙ্গে এ-বিষয়ে সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বললেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। বলা বাহুল্য এ-সব ক্ষেত্রে পণ্ডিতমহলে মতভেদের অবকাশ কম নয়। আমরা মতানৈক্যের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে এ-বিষয়ে সাধারণতঃ-স্বীকৃত সিদ্ধান্তগুলির মোটামুটি পরিচয় দিয়েই আলোচ্য প্রসঙ্গের অবতারণা করব।

উপনিষদের রচনাকাল

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল (খ্রী-পূ ৫৬৩-৪৮৩) যে উপনিষদের যুগের অব্যবহিত পরবর্তী, এ-বিষয়ে ঐতিহাসিকসমাজে মতপার্থক্য নেই। সুতরাং খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতককে মোটামুটিভাবে উপনিষদ্ রচনার কাল বলে গণ্য করা যায়। এ-বিষয়ে ভারততত্ত্ববিৎ কীথ সাহেবের (A. B. Keith) মত উদ্ধৃত করছি।—

The death of Buddha falls in all probability somewhere within the second decade of the fifth century before Christ: the older Upanishads can therefore be dated as

on the whole not later than 550 B. C. From that basis we must reckon backwards, taking such periods as seem reasonable. —*Cambridge History of India, Vol. I, p. 112*

'বুদ্ধের মৃত্যু হয় সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কোনো সময়ে; সুতরাং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলিকে খ্রীস্টপূর্ব ৫৫০ সালের এদিকে আনা যায় না। উপনিষদের যুগ নির্ণয় করতে হলে ওই তারিখ থেকে সম্ভবমত পিছু গণনা করেই অগ্রসর হতে হবে।' এই গ্রন্থেরই অন্যত্র (পৃ ১৪৭) কীথ বলেছেন,—

We cannot legitimately carry the Upanishads of the older type later than 550 or perhaps more probably 600 B.C.

'অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ধরনের উপনিষদ্‌গুলিকে আমরা যুক্তি-সংগতভাবে খ্রীস্টপূর্ব ৫৫০ অব্দের এদিকে টেনে আনতে পারি না; এমন কি, ওগুলি খ্রীস্টপূর্ব ৬০০ অব্দেরই পরবর্তী নয় এটাই অধিকতর সম্ভব।'

এর থেকে অনুমান করা অসংগত নয় যে, খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতকই উপনিষদ্ রচনার মুখ্য কাল।

গীতার রচনাকাল

ভগবদ্‌গীতার রচনাকাল সম্বন্ধে অন্যত্র[১] বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সুতরাং এস্থলে ঐতিহাসিকের অভিমত উদ্‌ধৃত করেই ক্ষান্ত হব। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসলেখক ভিনটারনিট্‌স্ (Winternitz) বলেন,—

There is evidence from inscriptions that, as early as the beginning of the second century B. C. the religion

[১] বাসুদেব কৃষ্ণ ও ভগবদ্‌গীতা—পূর্বাশা, ১৩৫৩ বৈশাখ; ধর্মবিজয়ী অশোক (১৩৫৯), পৃ ৩৪ ৩৬, ৯১-৯৪; গীতাবিচার—দেশ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৫৯।

of the Bhagavatas had found adherents even among the Greeks in Gandhara. It is perhaps not too bold to assume that the Old Bhagavadgita was written at about this time as an Upanishad of the Bhagavatas.

—*History of Indian Literature, Vol. I, p. 437-38*

'প্রাচীন ক্ষোদিতলিপি থেকে জানা যায় যে, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আরম্ভকালে গন্ধারবাসী গ্রীকদের মধ্যেও কেউ কেউ ভাগবত ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মূল ভগবদ্‌গীতা ভাগবত সম্প্রদায়ের উপনিষদ্ হিসাবে এই সময়েই লিখিত হয়েছিল, এই অনুমান সম্ভবতঃ খুব অযৌক্তিক নয়।'

কৃষ্ণপ্রবর্তিত ভাগবত ধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণেরা প্রথমে প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁরা বাসুদেব কৃষ্ণকে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলেই স্বীকার করেন এবং ভাগবত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সদ্‌ভাব স্থাপন করেন। যবনদূত হেলিওদোরসের বিদিশাস্থ গরুড়স্তম্ভলিপি থেকে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই বাসুদেব কৃষ্ণ গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুরূপে পূজিত হতেন। কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর এই অভিন্নতা প্রথম কখন স্বীকৃত হয় সে সম্বন্ধে ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেন,—

A clear indication of the identification of Vasudeva with Narayana-Vishnu is found in the Taittiriya Aranyaka...The Aranyaka probably dates from the third century B.C.

—*Early History of the Vaishnava Sect (1936), p. 107*

'বাসুদেব (কৃষ্ণ) ও বিষ্ণুর অভিন্নতাস্বীকৃতির প্রথম স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে। এই আরণ্যকটি সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের বই।'

উক্ত পুস্তকেই ডক্টর রায়চৌধুরী বলেন, খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের

একটি ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে যে বাসুদেবকে বিষ্ণু বলে স্বীকার করা হল এটা তাৎপর্যহীন নয়। তিনি অনুমান করেন অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলেই ব্রাহ্মণেরা আত্মরক্ষার্থ ভাগবত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করতে বাধ্য হয়েই বাসুদেব কৃষ্ণে বিষ্ণুত্ব আরোপ করেন (পৃ ৬, ১০৭)। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারেরও এই মত।[২]

গীতায়ও কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এক স্থলে (১০।২১) কৃষ্ণ নিজেই বলছেন, 'আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ'। তারপর অর্জুনও তাঁকে দুই বার বিষ্ণু বলে সম্বোধন করেছেন (১১।২৪, ৩০)। অতএব গীতাকে অশোকের পরবর্তী কালের গ্রন্থ বলেই স্বীকার করতে হয়। সব ঐতিহাসিক অবশ্য এ-বিষয়ে একমত নন। কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙের মতে গীতা খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্ববর্তী। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারের মতে এটি খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের সূচনাকালের পরবর্তী নয়। কিন্তু কারও মতেই গীতা বুদ্ধের পূর্ববর্তী নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নন। তা হলেও তাঁর ন্যায় মনস্বীর ইতিহাস-দৃষ্টির একটি বিশেষ মূল্য আছে। সুতরাং গীতার ঐতিহাসিক সত্য সম্বন্ধে তাঁর অভিমত উদ্‌ধৃত করা অসমীচীন হবে না। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত একখানি পত্রে (১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৮ তারিখে লিখিত) তিনি গীতার স্বরূপ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেছেন।—

'গীতার ঠিক ইতিহাসটি পাওয়া গেলেই ওর হেঁয়ালির মীমাংসা পাওয়া যেত। গীতার মধ্যে কোনো একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে। তাই ওর নিত্য অংশের সঙ্গে একটা ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছে। কোনো একজন মহাপুরুষের বাক্যকে কোনো একটি সংকীর্ণ ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করলে যে রকমটি হয়, গীতায় সে রকম একটা টানাটানি আছে। অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত

[২] *Ancient India (1952), p. 183*

করবার জন্যে আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তার মধ্যেও বিশুদ্ধ সত্যের সরলতা নেই। আমার মনে হয় বৌদ্ধ উপদেশে ভারতবর্ষকে যখন নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল, যখন অহিংসাধর্মের সাত্ত্বিকতা কেবলমাত্র negative লক্ষণাক্রান্ত, সুতরাং পূর্ণ সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল, তখন কোনো একজন মনস্বী পূর্বতন গুরুর উপদেশকে কর্মোৎসাহকরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সম্মুখে একটি সাময়িক প্রয়োজন অত্যন্ত উৎকট-ভাবে থাকাতে ব্যাখ্যাটির মধ্যে খুব উচ্চভাবের সঙ্গেও তর্কচাতুরী খানিকটা না মিশে থাকতে পারেনি। গীতার সঙ্গে সঙ্গে গীতার সেই ইতিহাসটি যদি দেখতে পাওয়া যেত তা হলে বোঝবার পক্ষে ভারি সুবিধা হত।'

গীতারচনার মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে যুদ্ধে প্রবর্তনা দান, আর প্রাণহননের বিরুদ্ধ মনোভাবকে প্রশমিত করা। গীতা পড়লে মনে হয় তৎকালে দেশে যুদ্ধবিমুখ মনোভাব খুবই প্রবল ছিল, অথচ যুদ্ধ করবার প্রয়োজনও প্রবল-ভাবেই দেখা দিয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ-রকম সংকট দেখা দিয়েছিল কখন? আমরা জানি কলিঙ্গযুদ্ধের (খ্রী-পূ ২৬১) পর থেকেই সম্রাট্ অশোক যুদ্ধপরিহার-নীতি স্বীকার করে নিয়েছিলেন, আর তাঁর মৃত্যুর (খ্রী-পূ ২৩২) অল্পকাল পর থেকেই আরম্ভ হয় যবনাদি বৈদেশিকদের উপর্যুপরি ভারত-আক্রমণ। এই সময়েই দেখা দেয় হিংসাবিরোধী মনোভাবকে অতিক্রম করে যুদ্ধে প্রবর্তনা দেবার তথা ধর্ম ও যুদ্ধকে সমন্বিত করবার প্রয়োজন। আত্মার অনশ্বরত্বের কথা উত্থাপন করে নরহননের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করবার আবশ্যকতা দেখা দেয় ও-রকম সংকট-কালেই। তাই গীতাকারকে তর্কচাতুরীর আশ্রয় নিয়েই প্রাণিহত্যা ও আত্মার অনশ্বরত্বের অবিরোধ প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে এবং ঐতিহ্যগত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রসঙ্গে কৃষ্ণার্জুন-সংবাদের অবতারণা করে ধর্মব্যাখ্যাচ্ছলে যুদ্ধের সার্থকতা প্রতিপন্ন করতে হয়েছে। এ-সব যুক্তির যদি কোনো

সারবত্তা থাকে তা হলে স্বীকার করতে হবে যে, অশোকের মৃত্যুর পরে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে যখন অশ্বমেধপরাক্রম পুষ্যমিত্র-প্রমুখ নৃপতিরা বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার কাছাকাছি কোনো সময়ে গীতা রচিত হয়েছিল।

ধম্মপদের রচনাকাল

বুদ্ধোপদিষ্ট ধম্মপদের সঙ্গে গীতার পৌর্বাপর্য নির্ণয় উপলক্ষ্যে ধম্মপদের রচনাকাল সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা প্রয়োজন।

বৌদ্ধ প্রসিদ্ধি অনুসারে বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশ প্রভৃতি তাঁর তিরোধানের পর অন্ততঃ তিন কিস্তিতে সংকলিত হয়েছিল। এই সংকলন-কার্যের সূত্রপাত হয় মহাপরিনির্বাণের (খ্রী-পূ ৪৮৩) অত্যল্পকাল পরে রাজগৃহের মহাসংগীতিতে (খ্রী-পূ ৪৭৭)। এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বুদ্ধদেবের বিশ্বস্ত শিষ্যসম্প্রদায়। কিন্তু তখন সংকলনকার্য স্পষ্টতঃই সম্পূর্ণ হয়নি এবং মতভেদেরও অবসান ঘটেনি। তাই আরও একশত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় মহাসংগীতি (খ্রী-পূ ৩৭৭) আহ্বানের প্রয়োজন অনুভূত হয়। আর তৃতীয় মহাসংগীতি আহূত হয় পাটলিপুত্রে প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বকালে (খ্রী-পূ ২৪৭)। এই তৃতীয় কিস্তিতে বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য যে রূপ ধারণ করে, বৌদ্ধগণের মতে তা-ই রাজপুত্র (মতান্তরে রাজভ্রাতা) মহেন্দ্র তাম্রপর্ণী অর্থাৎ সিংহল দ্বীপে নিয়ে যান। সেখানে এই বিপুল সাহিত্য আরও দু শো বৎসর মুখে মুখেই সংরক্ষিত ও প্রচারিত হয় এবং অবশেষে সিংহলরাজ বট্টগামনির (খ্রী-পূ ৮৮-৭৬) শাসনকালে স্থায়িভাবে লিপিবদ্ধ হয়। এই বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত এবং তাই ত্রিপিটক নামে পরিচিত। এর ভাষার নাম পালি। এই পালি ত্রিপিটক কালক্রমে ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। রক্ষা পেয়েছিল শুধু সিংহলে এবং সেখান থেকে প্রচারিত হয়েছিল ব্রহ্ম এবং

শ্যাম দেশে। সিংহল শ্যাম ও ব্রহ্ম এই তিনটি বৌদ্ধ দেশেই মূল পালি ত্রিপিটক এতকাল শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে অধীত ও রক্ষিত হচ্ছিল। অবশেষে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের আগ্রহে এই সিংহলী ত্রিপিটক শিক্ষিতসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

ত্রিপিটকের তিনটি বিভাগের নাম যথাক্রমে বিনয় সুত্ত ও অভিধম্ম। বিনয়পিটকে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়ম ও অনুশাসনাবলী সংগৃহীত হয়েছে। সুত্তপিটকে আছে বুদ্ধের বাণী ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের বিবরণ। আর অভিধম্মপিটকে আছে ওই ধর্মের তত্ত্ববিশ্লেষণ। ইতিহাসের বিচারে পিটকত্রয়ের মধ্যে সুত্তপিটকের মূল্যই সব চেয়ে বেশি। বস্তুতঃ বেদসমূহের মধ্যে ঋগ্‌বেদের যে স্থান, বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্যে সুত্তপিটকেরও সেই স্থান। বুদ্ধের জীবনচরিত ও বাণী, তাঁর প্রচারিত ধর্ম এবং তাঁর প্রধান শিষ্যবর্গের ইতিহাস রচনার প্রধান অবলম্বনই এই সুত্তপিটক। বৌদ্ধ সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট রচনাসমূহও সংকলিত হয়েছে এই পিটকেই। ধম্মপদ গ্রন্থটিও এই পিটকেরই অন্তর্গত। সুতরাং এটির আরও একটু বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

সুত্তপিটকের পাচ ভাগ। একেকটি ভাগকে বলা হয় নিকায় অর্থাৎ সংগ্রহ। নিকায়গুলির নাম যথাক্রমে দীঘ, মঝ্‌ঝিম, সংযুত্ত, অঙ্গুত্তর এবং খুদ্দক। এই খুদ্দক নিকায়ে পনেরোখানি বিভিন্ন প্রকৃতির গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলিও এক সময়ের রচনা নয়। বিভিন্ন সময়ে রচিত এই গ্রন্থসমূহ যে পরবর্তী কালে একত্র সংকলিত হয়ে খুদ্দক নিকায় নামে সুত্তপিটকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এ-বিষয়ে পণ্ডিতমহলে কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু এই সবগুলি গ্রন্থই যে অর্বাচীন তা নয়, বরং বৌদ্ধদের রচিত কোনো কোনো প্রাচীনতম পুস্তকও এই নিকায়েই স্থান পেয়েছে। শুধু তাই নয়। বৌদ্ধরচিত যে-সব গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের মধ্যে স্থান পেতে পারে, সেগুলিও এই

নিকায়েরই অন্তর্গত। খুদ্দক নিকায়ে সংকলিত পনেরোখানির মধ্যে দ্বিতীয় গ্রন্থ ধম্মপদই সমগ্র বৌদ্ধসাহিত্যের মধ্যে প্রসিদ্ধতম এবং এক হিসাবে ভারতীয় প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান বলে স্বীকৃত।

ধম্মপদ রচনার কাল সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ কোথাও নেই। এ-বিষয়ে কতকগুলি পরোক্ষ প্রমাণের উপরেই ঐতিহাসিকগণের একমাত্র নির্ভর। নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধদের বিশ্বাস ধম্মপদের উপদেশাবলী স্বয়ং বুদ্ধদেবেরই মুখনিঃসৃত, এবং ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় তাঁর অত্যল্পকাল পরেই রাজগৃহের মহাসংগীতিতে সংকলিত হয়। সুতরাং তদনুসারে ধম্মপদের গ্রন্থাকারে সংকলনকাল হচ্ছে খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের প্রথমাংশ। কিন্তু গীতার ন্যায় ধম্মপদের উপদেশসমূহ সবই ছন্দোবদ্ধ ভাষায় রচিত, সুতরাং অবিকল বুদ্ধবচন বলে স্বীকৃত হতে পারে না। তা ছাড়া ধম্মপদের বুদ্ধবগ্‌গ নামক চতুর্দশ অধ্যায়, বিশেষতঃ—

> যো চ বুদ্ধং চ ধম্মং চ সংঘং চ সরণং গতো ..
> এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্খা পমুচ্চতি ॥[৩]
>
> —বুদ্ধবগ্‌গ ১২-১৪

'যিনি বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করেন.. তিনি এই শরণগ্রহণের দ্বারা সর্বদুঃখ থেকে প্রমুক্ত হন',—এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, বুদ্ধদেবের তিরোধানের প্রায় অব্যবহিত পরেই এই গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল এ-কথা বিশ্বাস করা যায় না।

> পূজারহে পূজয়তো বুদ্ধে যদি ব সাবকে ..
> ন সক্কা পুঞ্ঞং সংখাতুং ইমেত্তমপি কেনচি ॥
>
> —বুদ্ধবগ্‌গ ১৭-১৮

---

৩ তুলনীয়: যো চ মামজমনাদিকঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ —গীতা ১০।৩
যিনি আমাকে অজ, অনাদি ও লোকমহেশ্বর বলে জানেন, সব মানুষের মধ্যে সেই অসংমূঢ় পুরুষই সর্ব পাপ থেকে প্রমুক্ত হন।

'পূজার্হ বুদ্ধগণ এবং তাঁদের শ্রাবক অর্থাৎ শিষ্যগণকে যিনি পূজা করেন তাঁর পুণ্যের ইয়ত্তা নির্ণয় করা যায় না।' এই উক্তিও বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বা তাঁর অব্যবহিত পরবর্তিকালীন বলে স্বীকার্য নয়। ধম্মপদ বুদ্ধের বেশ কিছুকাল পরেই সংকলিত হয়েছিল এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কতকাল পরে, সেটাই প্রশ্ন।

প্রচলিত ত্রিপিটকের মধ্যেই রাজগৃহ ও বৈশালীর মহাসংগীতির উল্লেখ আছে। তার থেকে অনুমান হয় যে, বর্তমান ত্রিপিটকের সংকলনকাল বুদ্ধের অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পরবর্তী। সুতরাং ধম্মপদও সম্ভবতঃ তৎপূর্ববর্তী নয়। একটি বৌদ্ধ প্রসিদ্ধি এই যে, ধম্মপদের অপ্পমাদ বগ্গ (দ্বিতীয় অধ্যায়) প্রিয়দর্শী অশোককে (খ্রী-পূ ২৭২-৩২) আবৃত্তি করে শোনানো হয়েছিল। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে, খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বেই ধম্মপদ সংকলন সমাপ্ত হয়েছিল। এই অনুমান কতখানি নির্ভরযোগ্য বিচার করে দেখা যাক।

সিংহলের পালি মহাকাব্য 'মহাবংস' (খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষার্ধে রচিত) থেকে জানা যায়, মগধে বুদ্ধগয়ার উপান্তবাসী এক ব্রাহ্মণ রেবত-নামক মহাস্থবিরের সঙ্গে তর্কে পরাজিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরে বুদ্ধঘোষ নামে প্রসিদ্ধ হন। গুরুর নির্দেশে তিনি মহানামের রাজত্ব-কালে (খ্রী ৪১০-৩২) সিংহলে গিয়ে অট্ঠকথা-নামক সিংহলী ব্যাখ্যা অবলম্বন করে ত্রিপিটকের পালি ভাষ্য রচনা করেন। ধম্মপদের পালি টীকাও তাঁরই রচিত বলে খ্যাত। সুতরাং ত্রিপিটক তথা ধম্মপদ যে খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকের পূর্ববর্তী তাতে সন্দেহ নেই। মিলিন্দপঞ্হ নামক সুখ্যাত পালিগ্রন্থে (খ্রী-পূ প্রথম শতক) সিংহলে ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ হয়েছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে। ত্রিপিটকের সংকলনকাল আরও পূর্ববর্তী বলে মনে করার হেতু আছে। ভরহুত এবং সাঁচির বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণের সময় যে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক, তার প্রমাণ আছে। এই স্তূপের বেষ্টনী-

প্রাচীরগাত্রে বুদ্ধের জীবনকাহিনী ও জাতকের অনেক গল্প চিত্রাকারে ক্ষোদিত আছে। তার থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ওই স্তূপ-নির্মাণকালে ত্রিপিটকে উল্লিখিত বুদ্ধের জীবনচরিত ও জাতককাহিনী-সকল সুবিদিত ছিল। শুধু তাই নয়, ভরহুত এবং সাঁচির স্তূপপ্রাচীরে ক্ষোদিত লিপিসমূহের মধ্যে পেটকী, সুতংতিক, পচনেকায়িক, ধম্মকথিক প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সে সময়েই পিটক-সাহিত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও প্রচার অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল। পঞ্চনিকায়জ্ঞের উল্লেখ থেকে মনে হয় তৎকালে সমগ্র সুত্তপিটকই বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল।

এ-সমস্ত এবং আরও অন্যান্য কারণে পণ্ডিতেরা মনে করেন, ত্রিপিটক-সাহিত্য খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে, অর্থাৎ অশোকের সময়ে বা তাঁর কিছু পূর্বেই প্রচলিত ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় মহাসংগীতিতেই ত্রিপিটকসংকলন কার্যতঃ সমাপ্ত হয়েছিল এবং অশোককে ধম্মপদের অপ্পমাদ বগ্গ শোনানো হয়েছিল, এই বৌদ্ধ প্রসিদ্ধি ভিত্তিহীন না হতেও পারে। ভাষার বিচারেও দেখা যায় অশোকের অনুশাসনাবলী এবং ত্রিপিটকের ভাষা এক না হলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। ত্রিপিটকসাহিত্যে রাজগৃহ ও বৈশালীর মহাসংগীতির কথা আছে, কিন্তু পাটলিপুত্রের মহাসংগীতি বা অশোকের নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই। তাতেও ত্রিপিটককে মোটামুটিভাবে অশোকের পূর্ববর্তী বলেই স্বীকার করা যায়। পূর্বে বলেছি ধম্মপদে যে বুদ্ধ- ধর্ম- ও সংঘ-শরণ তথা পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের উল্লেখ আছে, তার থেকে উক্ত গ্রন্থকে বুদ্ধের বেশ কিছুকাল পরবর্তী বলে মনে করাই সমীচীন। ভাবরু অনুশাসনে স্বয়ং অশোক বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে জানাচ্ছেন ভগবান্ বুদ্ধ যা কিছু বলেছেন সবই উত্তম,—'এ কেংচি ভংতে ভগবতা বুধেন ভাসিতে সবে সে সুভাসিতে বা'। এই সম্পর্কেই তিনি সংঘের ভিক্ষুসম্প্রদায়কে

অভিবাদন করে জানাচ্ছেন যে, সদ্ধর্মের (অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের) চিরস্থিতির জন্য ভিক্ষু-ভিক্ষুণী এবং উপাসক-উপাসিকা সকলের পক্ষেই কয়েকটি ধর্মপর্যায় (অধ্যায়) বিশেষভাবে জানা ও স্মরণ রাখা উচিত। অতঃপর অশোক বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য সাতটি ধর্ম-পর্যায়ের নাম দিয়েছেন। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় অশোকের সময়ও একটি সুবিস্তৃত বৌদ্ধ সাহিত্য বিদ্যমান ছিল। আর, সে সাহিত্য এবং পালি ত্রিপিটকসাহিত্য সম্পূর্ণ এক না হলেও যে অনেকাংশেই এক তার প্রমাণ এই যে, অশোকের নির্দিষ্ট অধ্যায়গুলি আধুনিক ত্রিপিটকেও পাওয়া যাচ্ছে।

ভাবরুলিপি থেকে জানা গেল অশোকের সময়েই বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, অশোকের সময়ে পূর্বগামী বুদ্ধদের পূজাও প্রচলিত হয়েছিল। তার প্রমাণ অশোকের নিগ্‌লীব স্তম্ভলিপি। এর থেকে জানা যায় অশোক নিজেই 'কোনাগমন' বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে একটি স্তূপ ও একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং ধম্মপদ তথা ত্রিপিটকের অন্যান্য অংশে বুদ্ধ- ধর্ম- ও সংঘ-শরণ এবং পূর্বগামী বুদ্ধপূজার কথা থাকা সত্ত্বেও সে-সব অংশ অশোকের সমকালীন বা আরও পূর্ববর্তী হওয়া অসম্ভব নয়।

বস্তুতঃ এইসব তথ্য বিবেচনা করেই বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক সুপ্রসিদ্ধ ভিনটারনিট্‌স্ সিদ্ধান্ত করেছেন,—

At some period prior to the second century B. C., probably as early as the time of Asoka or a little later, there was a Buddhist Canon, which, if not entirely identical with our Pali Canon, resembled it very closely.... The texts contained in the latter hark back to an early period, not so very far removed from the time of Buddha

himself, and in any case may be regarded as the most trustworthy evidences of the original doctrine of Buddha and the Buddhism of the first two centuries after Buddha's death. —*History of Indian Literature, Vol. II, p. 18*

'অশোকের সমকালে অথবা তাঁর কাছাকাছি সময়ে, কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্বেই, এমন একটি বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য ছিল যা আধুনিক পালি ত্রিপিটকের সঙ্গে অবিকল এক না হলেও অনেকাংশেই তার অনুরূপ। প্রচলিত ত্রিপিটকে যে পাঠ পাওয়া যায় তা খুবই প্রাচীন এবং বুদ্ধের সময় থেকে খুব দূরবর্তী নয়, আর তাকেই বুদ্ধের মূলনীতি তথা তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী প্রথম দুই শতকের বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নিদর্শন বলে স্বীকার করা যায়।'

বলা বাহুল্য ত্রিপিটকের সমস্ত অংশ একই সময়ের রচিত নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে খুদ্দক নিকায়ের পনেরোখানি গ্রন্থের কতকগুলি অতি প্রাচীন এবং অন্যগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বলেই পণ্ডিতসমাজের অভিমত। বস্তুতঃ সমগ্র ত্রিপিটকই যে অশোকের পূর্ববর্তী এ-কথাও স্বীকার করা যায় না। এই সাহিত্যে উক্ত মৌর্যসম্রাটের নাম কোথাও স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয়নি বটে, কিন্তু তাঁর পরোক্ষ উল্লেখ আছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ের অব্যাকতবগ্‌গে জম্বুখণ্ডের যে চক্রবর্তী অধীশ্বর অদণ্ড ও অশস্ত্রের দ্বারা পৃথিবীজয় এবং অপীড়ন ও ধর্মের দ্বারা রাজ্যশাসন করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছেন, তিনি যে ধর্মবিজয়ী রাজা প্রিয়দর্শী অশোক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং ত্রিপিটকসাহিত্য মোটামুটিভাবে বুদ্ধের পরে দু শো বছরের মধ্যে রচিত এবং অশোকের পূর্ববর্তী এ-কথা স্বীকার করলেও ধম্মপদ কত প্রাচীন সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র উত্তরের অপেক্ষা রাখে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ধম্মপদের ছন্দোবদ্ধ ভাষাকে অবিকল বুদ্ধবচন বলে

স্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া বুদ্ধ এই গ্রন্থের সব উপদেশই এক সঙ্গে দিয়েছিলেন এ-কথাও স্বীকৃত হতে পারে না। সুতরাং মানতেই হবে যে, ধম্মপদের উপদেশাবলী পরবর্তী কালের সংকলনমাত্র। ভগবদ্-গীতার সমস্ত উপদেশ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে এক উপলক্ষ্যে একই কালে প্রদত্ত হয়েছিল বলে কল্পনা করা হয়েছে। ধম্মপদ ও-রকম কোনো কল্পিত ভূমিকার উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। বস্তুতঃ এই গ্রন্থের টীকাতে স্পষ্টই স্বীকৃত হয়েছে যে, ধম্মপদ আসলে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বুদ্ধের উপদেশসমূহের সংগ্রহমাত্র। এই সংগ্রহকর্তা যিনিই হন তিনি নিজের রুচি এবং বিবেচনা অনুসারেই উপদেশসমূহ নির্বাচন ও বিন্যাস করেছেন। এই নির্বাচন ও বিন্যাসে যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচয় আছে বটে, কিন্তু স্বভাবতঃই তাতে কালক্রম রক্ষিত হয়নি। সুখের বিষয় এই যে, ধম্মপদের অর্ধেকেরও বেশি শ্লোক ত্রিপিটকের অন্যান্য অংশে যথা-স্থানেও (অর্থাৎ যে স্থান থেকে সংকলনকর্তা নিয়েছেন) পাওয়া গিয়েছে। এগুলিই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলে মনে করা যায়; বাকিগুলি সম্ভবতঃ তুলনায় অর্বাচীন। ত্রিপিটকের কোনো কোনো অংশ যে অতিপ্রাচীন, এমন কি বুদ্ধের সমকালীন, তাতে সংশয় নেই। সে-সব অংশে ধম্মপদের যে-সকল শ্লোক পাওয়া গিয়েছে সেগুলিকে স্বয়ং বুদ্ধের উপদেশবাণী বলে স্বীকার করা যায়। তার দৃষ্টান্ত যথাস্থানে দেখাব। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন উপদেশগুলি সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছুই বলা যায় না। ধম্মপদের কোনো কোনো বাণী হয়তো পরবর্তী কালে বুদ্ধের মুখে বসানো হয়েছে। কিন্তু দুএকটি বাদে (যেমন, 'যো চ বুদ্ধং চ ধম্মং চ' কিংবা 'পূজারহে পূজয়তো বুদ্ধে' ইত্যাদি) তার কোনোটিই বুদ্ধের পক্ষে অযোগ্য বা অস্বাভাবিক নয়, তাই তাঁর মুখে বসানোও অসংগত হয়নি। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করলে এ-কথা মানতে হয় যে, ত্রিপিটকসাহিত্য সম্বন্ধে ভিনটারনিট্‌স্ সাধারণভাবে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, ধম্মপদ সম্বন্ধেও তা

সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ ধম্মপদের প্রচলিত পাঠ বুদ্ধের সময় থেকে খুব দূরবর্তী নয় এবং তাকে বুদ্ধের মূল উপদেশ তথা তাঁর পরবর্তী প্রথম দুই শতকের ধর্মনীতির প্রাচীনতম ও প্রকৃষ্টতম নিদর্শন বলেই স্বীকার করা যায়। অন্য প্রমাণের দ্বারাও এই অনুমান সমর্থিত হয়। মিলিন্দপঞ্হ নামক বিখ্যাত পালিগ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় ধম্মপদের উল্লেখ আছে এবং সে উল্লেখ এমনভাবেই আছে যাতে মনে হয় এই গ্রন্থ রচনার সময়ে ধম্মপদ একটি প্রাচীন পুস্তক বলেই গণ্য হত। মিলিন্দপঞ্হ রচনার কাল আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতক। অভিধম্মপিটকের অন্তর্গত কথাবত্থু নামক গ্রন্থটি অশোকের আমলের অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের রচনা বলে প্রসিদ্ধি আছে। ঐতিহাসিকরাও এই প্রসিদ্ধিকে সত্য বলেই মনে করেন। এই গ্রন্থে এমন কতকগুলি শ্লোক আছে যা ধম্মপদ ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং কথাবত্থু ও ধম্মপদের মধ্যে যেটিই উত্তমর্ণ হক ওই শ্লোকগুলি যে অশোকের পূর্ববর্তী তাতে সন্দেহ থাকে না।

এ-সব নানা কারণে পণ্ডিতেরা ধম্মপদকে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকের গ্রন্থ বলে মনে করেন, কিন্তু তা হলেও এই গ্রন্থের উপদেশগুলি যে প্রধানতঃ বুদ্ধেরই উপদেশ তাতে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই।

৩

ধম্মপদের ভারতীয় রূপ

ধম্মপদের বাণী ও নীতি সাধারণতঃ বুদ্ধের বাণী ও নীতি বলেই পরিচিত। কিন্তু এটাই তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। এই বাণী ও নীতি-সমূহকে বৌদ্ধ বলে অভিহিত করলে তার স্বরূপটিই প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। বস্তুতঃ ধম্মপদ বা বুদ্ধবাণীকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষেরই একটি বিশিষ্ট আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে, এটাই তার সত্য পরিচয়। ধম্মপদের কোনো উক্তিকেই সম্ভবতঃ সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধের স্বকীয় বলে বর্ণনা করা যায় না। ভারতবর্ষের কতকগুলি বাণী ও নীতিকে বুদ্ধদেব স্বীয় আদর্শ ও চরিত্রের প্রভাবে এক অপূর্ব মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলেছেন, এটাই ওগুলির বৈশিষ্ট্য ও গৌরব এবং এ-হিসাবেই ওগুলিকে বৌদ্ধ বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু বৌদ্ধত্ব তার বিশেষ পরিচয় হলেও ভারতবর্ষীয়তাই তার আসল স্বরূপ। তার প্রমাণ এই যে, ভারতবর্ষের অবৌদ্ধ সাহিত্যেও প্রায়শঃই এই নীতিগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভের অল্পকালের মধ্যেই মনীষীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'বৌদ্ধধর্ম' নামক তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে (প্রথম সংস্করণ ১৯০২) এই প্রসঙ্গে বলেছেন,—

ইহাতে (ধম্মপদে) যে-সকল ধর্মপ্রবচন ও হিতোপদেশ আছে, আমাদের মহাভারত গীতা এবং অন্যান্য নীতিশাস্ত্রে তাহার অনুরূপ কথার অপ্রতুল নাই, কতক বিষয়ে অবিকল সাদৃশ্যও উপলক্ষিত হয়।

—বৌদ্ধধর্ম, পৃ ১৩৮

চারুচন্দ্র বসু-সম্পাদিত ধম্মপদের (প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯০৪) ভূমিকাতে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেছেন, "অনেক স্থলে

মনুসংহিতা মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের বচনের সহ ধম্মপদ প্রভৃতি পালি গ্রন্থের বচনের সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হয়"। এরূপ সম্পূর্ণ ঐক্যের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ধম্মপদের কোধবগ্‌গে আছে—

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং॥

—ধম্মপদ ১৭।৩

এর অবিকল সংস্কৃত প্রতিরূপ আছে মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্বে। যথা—

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্‌ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্‌॥

—উদ্‌যোগপর্ব ৩৮।৭৩-৭৪

'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ ১৮৯৮) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এটির যে বাংলা অনুবাদ করেছেন, এখানে তা উদ্‌ধৃত করছি।—

অক্রোধে জিনিবে ক্রোধ
অসাধুতা সাধু আচরণে।
অসত্য জিনিবে সত্যে
কদর্যে করিবে বশ ধনে॥

—পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম, দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়

এই প্রসঙ্গে মনস্বী ভিনটারনিট্‌স্‌ লিখেছেন,—

The collection (Dhammapada) has come to include some sayings which were originally not Buddhist at all, but were drawn from that inexhaustible source of Indian gnomic wisdom, from which they also found their way into Manu's Law-book, into the Mahabharata, the texts of the Jains, and into the narrative works such as the

Panchatantra etc. It is, in general, impossible to decide where such sayings first appeared.

—*History of Indian Literature, Vol. II (1933.), p. 84*

'ধম্মপদ গ্রন্থে এমন কতকগুলি উক্তি আছে যা মূলতঃ বৌদ্ধ নয়; ভারতবর্ষেরই অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে এই নীতিসূত্রগুলি সংকলিত হয়েছে। আর ভারতবর্ষের সাধারণ ভাণ্ডার থেকেই এগুলি মনুসংহিতা, মহাভারত, জৈন সাহিত্য এবং পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি কথাপুস্তকেও স্বীকৃত হয়েছে। এই সূক্তগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোথায় প্রথম স্থান পেয়েছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।'

ধম্মপদের এই ভারতীয়তার কথা রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও ভাষায় যেমন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে তেমন আর কোথাও নয়। সুতরাং তাঁর উক্তি এখানে উদ্‌ধৃত করছি।—

এই গ্রন্থে যে-সকল উপদেশ আছে তাহা সমস্তই বুদ্ধের রচনা কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন; অন্ততঃ এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে, এই সকল নীতিবাক্য ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময়ে এবং তাঁহার পূর্বকাল হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।.. বুদ্ধ এইগুলিকে চতুর্দিক্ হইতে সহজে আকর্ষণ করিয়া আপনার করিয়া, সুসম্বদ্ধ করিয়া, ইহাদিগকে চিরন্তনরূপে স্থায়িত্ব দিয়া গেছেন।.. এইজন্যই কি ধম্মপদে, কি গীতায়, এমন অনেক কথাই আছে, ভারতের অন্যান্য গ্রন্থে যাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

—ধম্মপদং, ভারতবর্ষ

বস্তুতঃ ধম্মপদের সূক্তিসমূহ প্রধানতঃ ভারতবর্ষের সাধারণ নীতিভাণ্ডার থেকেই সংগৃহীত, তবে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের দ্বারা বিশেষভাবে স্বীকৃত বলেই এগুলি বৌদ্ধ নীতি বলে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এ-কথার তাৎপর্য স্পষ্ট হবে।

খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে বিদিশা নগরীতে (মালবের অন্তর্গত

আধুনিক বেস নগরে) কাশীপুত্র ভাগভদ্র নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তৎকালে গন্ধার জনপদ (বর্তমান রাওলপিণ্ডি অঞ্চল) ছিল অন্‌তিঅল্‌কিদস্‌ নামক এক গ্রীক রাজার অধীন। তিনি হেলিওদোরস্‌ নামে তক্ষশিলাবাসী জনৈক গ্রীককে রাজদূতরূপে বিদিশায় প্রেরণ করেন। হেলিওদোরস্‌ ছিলেন ভাগবত অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। তিনি ভাগভদ্রের রাজত্বের চতুর্দশ বৎসরে বিদিশা নগরীতে দেবদেব বাসুদেবের উদ্দেশ্যে একটি গরুড়ধ্বজ (অর্থাৎ গরুড়ারূঢ় স্তম্ভ) স্থাপন করেন এবং এই স্তম্ভের গাত্রেই উক্ত তথ্যগুলি খোদাই করিয়ে রাখেন। এই লিপির নিম্নে তাঁর ইষ্টমন্ত্রটিও ক্ষোদিত আছে। মন্ত্রটি হচ্ছে এই।—

ত্রিনি অমুতপদানি সুঅনুঠিতানি
নয়ংতি স্বগ দম চাগ অপ্রমাদ।

'দম ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই তিনটি অমৃতপদ সুঅনুষ্ঠিত হলে স্বর্গলাভ হয়।'

বোঝা যাচ্ছে দম ত্যাগ ও অপ্রমাদ হচ্ছে ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্মের মূলনীতি। ভাগবত সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থ মহাভারতেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। যথা—

দমস্ত্যাগোঽপ্রমাদশ্চ তে ত্রয়ো ব্রহ্মণো হয়াঃ।
শীলরশ্মিসমাযুক্তঃ স্থিতো যো মানসে রথে।
ত্যক্ত্বা মৃত্যুভয়ং রাজন্‌ ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি।

—স্ত্রীপর্ব ৭।২৩-২৪

'দম ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই তিনটি ব্রহ্মার অশ্ব। যিনি শীলরূপ রশ্মি নিয়ে (উক্ত তিন অশ্বযুক্ত) মানসরথে আরোহণ করেন, তিনি মৃত্যুভয় ত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে (অর্থাৎ স্বর্গে) গমন করেন।'

উদ্‌যোগপর্বের [illegible] সনৎসুজাত বিভাগেও এই নীতিগুলির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে।—

দমস্ত্যাগোঽপ্রমাদশ্চ এতেষ্বমৃতমাহিতম্।

—উদ্‌যোগপর্ব ৪৩।২২

'দম ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই তিনটিতেই অমৃত নিহিত আছে।'

এই বিভাগের অন্যত্রও (উদ্‌যোগ ৪৫।৭) প্রায় অবিকল উক্তি আছে। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় সনৎসুজাতীয় অধ্যায়গুলিতে উক্ত তিন নীতির মধ্যে অপ্রমাদকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দান করা হয়েছে। স্থলবিশেষে একমাত্র অপ্রমাদকেই অমৃতত্বের হেতু বলে বর্ণনা করা হয়েছে।—

প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি
তথাপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি।

—উদ্‌যোগপর্ব ৪২।৪

'আমার মতে প্রমাদই মৃত্যু এবং অপ্রমাদই অমৃত।'

গীতা ভাগবত সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থেও উক্ত নীতিগুলির কথা আছে, কিন্তু এগুলিকে ততটা প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। গীতার তিন স্থানে (১০।৪, ১৬।১, ১৮।৪২) অন্যান্য অনেক নীতির মধ্যে দমের উল্লেখ আছে, কিন্তু এটির কিছুমাত্র প্রাধান্য স্বীকৃত হয়নি। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ত্যাগের যথেষ্ট গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।

—গীতা ১৮।২

'সর্বকর্মের ফলত্যাগকেই জ্ঞানীরা ত্যাগ বলে থাকেন।'

কর্মের আসক্তি এবং ফলকামনাত্যাগকেই এই অধ্যায়ে যথার্থ ত্যাগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অপ্রমাদ শব্দটি গীতায় কোথাও নেই। তবে চতুর্দশ অধ্যায়ে (৮, ৯, ১৩, ১৭ শ্লোক) তমোগুণজ প্রমাদ বর্জন প্রসঙ্গে পরোক্ষে অপ্রমাদের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এক হিসাবে তমোবিনাশকেই

ভাগবত ধর্মের মূলকথা বলে মনে করা যায়। সুতরাং এ ধর্মে অপ্রমাদের স্থান গৌণ নয়।

সে যাই হক, এই আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহেই বোঝা যায় ভাগবত ধর্মের অন্যতম প্রধান নীতি হচ্ছে অপ্রমাদ। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ ধর্মের শ্রেষ্ঠ নীতিও এটিই। দীপবংস নামক সিংহলের পালিকাব্যে আছে যে, অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তনা পেয়েছিলেন ন্যগ্রোধ নামক একজন ভিক্ষুর কাছ থেকে। আরও আছে,—বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি কি, অশোকের এই প্রশ্নের উত্তরে ন্যগ্রোধ তাঁকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোনালেন।—

অপ্পমাদো অমতপদং প্রমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি, যে পমত্তা যথা মতা॥

'অপ্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ। যারা অপ্রমত্ত তাদের মৃত্যু হয় না, যারা প্রমত্ত তারা মৃতেরই শামিল।'

এই প্রসঙ্গে সনৎসুজাতের 'প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি, তথাপ্রমাদ-মমৃতত্বং ব্রবীমি' এই উক্তিটি স্মরণীয়। যা হক, দীপবংসের এই কাহিনীটি থেকে নিঃসন্দেহেই বোঝা যায় যে, বৌদ্ধদের মতে অপ্রমাদই হচ্ছে উক্ত ধর্মের মূলনীতি। আধুনিক ঐতিহাসিকদের বিচারেও এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন,—

Apramada was the root principle or basic idea of Buddha's teachings·· With Buddha *appamada* is the single term by which the whole of his teaching might be summed up.

—*Asoka and His Inscriptions (1946), pp. 27, 250*

'অপ্রমাদই হল বুদ্ধদেবের সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি বা মূলনীতি। তাঁর মতে এই অপ্রমাদ কথাটির মধ্যেই তাঁর সমস্ত উপদেশের সারমর্ম নিহিত রয়েছে।'

সংযুত্ত নিকায়ের অন্তর্গত কোসল-সংযুত্ত সুত্তে আছে কোসলরাজ প্রসেনজিৎকে বুদ্ধ বলেছিলেন, সকলের পক্ষেই একমাত্র ধর্ম হচ্ছে অপ্রমাদ।

অপ্পমাদো খো মহারাজ একো ধম্মো।

—কোসল-সংযুত্ত ২।৭-৮

বুদ্ধোপদিষ্ট ধর্মের সারমর্ম নির্ণয়প্রসঙ্গে ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেন,—

প্রত্যেকের নির্বাণলাভের জন্য উদ্যম ও অপ্রমাদ অত্যাবশ্যক, ইহাই ভগবান্ বুদ্ধের শেষ বাণী। —ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৯৩৪), পৃ ৪৯

যা হক, বুদ্ধপ্রবর্তিত ধর্মের মূলনীতি যে এই অপ্রমাদ তাতে সন্দেহ নেই। আমরা দেখেছি অশোকের কাছে ন্যগ্রোধকথিত শ্লোকটির তাৎপর্যও তাই। ওই সুখ্যাত শ্লোকটি হচ্ছে ধম্মপদ গ্রন্থের অপ্পমাদ বগ্গ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক। সুতরাং সন্দেহ নেই যে, ধম্মপদ গ্রন্থে বুদ্ধবাণী অনেকাংশেই যথাযথভাবে সংগৃহীত হয়েছে। ভিনটারনিট্স্ বলেন,—

We may without laying ourselves open to the charge of credulousness, regard as originating with Buddha himself, speeches such as the famous sermon of Benares·· some of the farewell speeches handed down in the Mahaparinibbanasutta, and some of the short utterances handed down as "words of Buddha" in the Dhammapada.

—*History of Indian Literature, Vol II. pp. 2-3*

'ধম্মচক্কপবত্তনসুত্তে ধৃত উপদেশবাণী, মহাপরিনিব্বানসুত্তে ধৃত বিদায়বাণী এবং ধম্মপদে ধৃত কতকগুলি নীতিবচনকে যথার্থই বুদ্ধের উক্তি বলে স্বীকার করলে তাকে অন্ধবিশ্বাস বলে গণ্য করা চলে না।'

দেখা গেল, ভাগবত ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেরই প্রধান নীতি হচ্ছে

অপ্রমাদ। তার থেকে দুই সিদ্ধান্ত হতে পারে,—হয় এক ধর্ম আরএক ধর্মের কাছ থেকে এই নীতিটিকে স্বীকার করে নিয়েছে, না-হয় উভয় ধর্মই এই নীতিটিকে ভারতীয় সাধারণ চারিত্রভাণ্ডার থেকে গ্রহণ করেছে। এই দ্বিতীয়টিই যে সত্য তার প্রমাণ এই যে, বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী উপনিষদেও এই নীতির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। যথা—

সত্যান্ ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ ন প্রমদিতব্যম্।
কুশলান্ ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্।
—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১।১১

'সত্য থেকে প্রমত্ত (অর্থাৎ ভ্রষ্ট বা বিচলিত) হয়ো না। ধর্ম থেকে প্রমত্ত হয়ো না।' ইত্যাদি।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ।
—মুণ্ডক উপনিষদ্ ৩।২।৪

'এই আত্মা বলহীন বা প্রমত্ত জনের লভ্য নয়।'

সুতরাং সন্দেহ নেই যে, অপ্রমাদ নীতি ভারতবর্ষেরই চিরন্তন নীতি, অশোকের ভাষায় 'পোরাণা পকিতী'। পরবর্তী কালে বুদ্ধ এটিকেই সদ্ধর্মের মূলনীতি বলে ঘোষণা করেন,—অপ্‌পমাদো খো একো ধম্মো। আর, ভাগবতরাও এটিকে অন্যতম প্রধান নীতি বলে স্বীকার করেন।

এবার প্রমাদ কথার তাৎপর্য বিচার করা যাক। মেঘদূতের প্রথমেই আছে 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ'। মল্লিনাথ প্রমত্ত কথার অর্থ করেছেন অনবহিত। অমরকোষে আছে 'প্রমাদোঽনবধানতা'। বস্তুতঃ প্রাচীন প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, কর্তব্য বিষয়ে অনিবিষ্টতা বা অবহেলারই নাম প্রমাদ এবং স্বাধিকার বা স্বকর্তব্যে অবিচলিত নিষ্ঠাই অপ্রমাদ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় অপ্রমত্ততার জন্য চাই সদাজাগ্রত উদ্যম ও আত্মনির্ভরতা বা পুরুষকার। তাই বৌদ্ধ ধর্মনীতিতে অপ্রমাদের সঙ্গে এই দুটি নীতির উপরেও যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে

উদ্যমের প্রতিশব্দ হিসাবে উত্থান, উৎসাহ, পরাক্রম প্রভৃতি কথার প্রয়োগ দেখা যায়। অশোকের অনুশাসনসমূহে অপ্রমাদ কথার ব্যবহার নেই বটে, কিন্তু উত্থান প্রভৃতির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। বস্তুতঃ এগুলিই হচ্ছে অশোকের জীবন- ও রাষ্ট্র-নীতির মূলকথা। এ-বিষয়ে ডক্টর বড়ুয়ার উক্তি উদ্‌ধৃত করছি।—

Parakrama, pakama, uyama, usaha, and uthana are the key-words of Asoka's life as well as his government.

—*Asoka and His Inscriptions, p. 214*

'পরাক্রম, উদ্যম, উৎসাহ এবং উত্থান, এগুলিই হল অশোকের শাসন তথা তাঁর জীবনের মূলকথা।'

অশোকানুশাসনের একটি অংশ তুলে দিলেই এ-কথার যথার্থতা বোঝা যাবে।—

কতয়্‌বমতে হি মে সর্বলোকহিতং। তস চ পুন এস মূলে উস্‌টানং।

—ষষ্ঠ পর্বতলিপি (গিরনার)

'সর্বলোকহিতই কর্তব্য! কিন্তু তার মূল হচ্ছে উত্থান।'

গীতায় ধর্ম বা জীবনের নীতি হিসাবে উত্থান শব্দের প্রয়োগ নেই, যদিও সাধারণ অর্থে একাধিকবার উত্তিষ্ঠ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে (যথা— ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ)। ধম্মপদে অপ্রমাদের পাশেই উত্থানের স্থান দেওয়া হয়েছে। যথা—

উট্‌ঠানেনপ্পমাদেন সংযমেন দমেন চ।
দীপং কয়িরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি॥

—অপ্‌পমাদবগ্‌গ ৫

'মেধাবী উত্থান অপ্রমাদ সংযম ও দমের দ্বারা এমন দ্বীপ তৈরি করবেন যা প্লাবনেও ধ্বংস হবে না।'

লক্ষ্য করার বিষয়, যবনদূত হেলিওদোরসের ইষ্টমন্ত্রের মতো এখানেও

অপ্রমাদের সঙ্গে দমগুণ উল্লিখিত হয়েছে। আরও লক্ষ্য করার বিষয়, এখানে মেধাবীকে উত্থান অপ্রমাদ প্রভৃতির দ্বারা নিজেই নিজের আশ্রয়-দ্বীপ রচনা করতে বলা হয়েছে। কেননা আত্মনিষ্ঠতা ব্যতীত উত্থান তথা অপ্রমাদ সম্ভব নয়। তাই বৌদ্ধধর্মে আত্মনিষ্ঠার উপরে খুবই জোর দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে আনন্দকে লক্ষ্য করে ভগবান্ বুদ্ধ যে শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন তার মূলকথাই ওই আত্মনিষ্ঠা।

অত্তদীপা অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা বিহরথ
ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা।

—দীঘনিকায়, মহাপরিনিব্বানসুত্ত

'আত্মার (নিজের) ও ধর্মের দ্বীপ রচনা করে আশ্রয় নাও; আত্মা ও ধর্মেরই শরণ নাও, আর কারও নয়।' ধম্মপদেও ঠিক এই কথাই আছে।—

অত্তা হি অত্তনো নাথো কো হি নাথো পরো সিয়া।
অত্তনা হি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং॥ —অত্তবগ্গ ৪

'নিজেই নিজের আশ্রয়, অন্য আশ্রয় আর কে হবে? নিজেকে দমযুক্ত (অর্থাৎ সংযত) করলেই দুর্লভ আশ্রয়লাভ হয়।' অন্যত্রও এই উপদেশ পাওয়া যায়। যথা—

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
স এব নিয়তো বন্ধুঃ স এব নিয়তো রিপুঃ॥

—মহর্ষিকৃত ব্রাহ্মধর্ম, ২।৪।১১

'যে নিজেকে নিজে জয় করেছে, সে নিজেই নিজের বন্ধু। নিজেই নিজের নিত্যবন্ধু বা নিত্যশত্রু।'

এর বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় গীতায়।—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥—গীতা ৬।৫-৬

'নিজেকে কখনও অবসন্ন করবে না, নিজেই নিজের উদ্ধারসাধন করবে; কেননা প্রত্যেকে নিজেই নিজের বন্ধু অথবা শত্রু। যে নিজেকে জয় (অর্থাৎ সংযত) করে সে নিজেই নিজের বন্ধু হয়, যে তা করে না সে নিজেরই শত্রুতা করে।'

বলা বাহুল্য, এটি ধম্মপদবাণীরই বিস্তারমাত্র। তৎসত্ত্বেও এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে. আত্মশরণ গীতার মূলনীতি নয়। কারণ, প্রথমতঃ আত্ম-শরণনীতি ও ভক্তি পরস্পরের অনুকূল বা পরিপূরক নয় এবং গীতাধর্ম যে আসলে ভক্তির ধর্ম এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণকথিত 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' (গীতা ১৮।৬৬) এবং বুদ্ধকথিত 'অত্তদীপা অত্তসরণা অনঞ্ঞ-সরণা বিহরথ' এই দুই নীতি যে সম্পূর্ণরূপেই পরস্পর-বিরোধী এ-কথা বলারও অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে এই আত্মশরণ ও উত্থান যে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান নীতি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দুটি যে মূলতঃ বৌদ্ধ নয় তার প্রমাণ আছে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' (মুণ্ডক ৩।২।৪) উপনিষদের এই বাণীতে আত্মনিষ্ঠ পুরুষকারের পরিচয় পাই, আর 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' (কঠ ৩।১৪) এই বাণীতে উত্থাননীতির প্রয়োগ সুস্পষ্ট।

অতএব দেখা গেল, অপ্রমাদ উত্থান ও আত্মশরণ এই তিনটি বৌদ্ধদের দ্বারা বিশেষভাবে স্বীকৃত হলেও এগুলি আসলে ভারতবর্ষেরই চিরন্তন নীতি। ত্রিপিটক তথা ধম্মপদের অন্যান্য বাণী সম্বন্ধেও একথা অল্লাধিক পরিমাণে প্রযোজ্য। ভারতবর্ষে পুরাকাল থেকেই যে-সকল নীতি প্রচলিত ছিল, বুদ্ধ তার মধ্য থেকে নিজের আদর্শ অনুযায়ী কতকগুলিকে বেছে নিয়েছিলেন। সেগুলি তাঁর চরিত্র- ও উপদেশ-প্রভাবে এক নূতন গৌরব লাভ করেছিল বলেই পরবর্তী কালে বৌদ্ধ বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

৪

বিশ্ববিজয়ের প্রস্থানত্রয়

উপনিষদ্ ধম্মপদ ও গীতা, ভারতীয় সংস্কৃতির এই তিনটি কেন্দ্রজ্যোতির প্রতি আধুনিক সভ্য জগতের দৃষ্টি যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, এটা কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নয়। বস্তুতঃ এই তিন মহারত্নই ভারতবর্ষকে বিশ্বসমাজে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে এ-কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। উপনিষদ্ গীতা ও ব্রহ্মসূত্র, এই তিনটি ভারতীয় দর্শনের প্রস্থানত্রয় নামে পরিচিত। আধুনিক কালে উপনিষদ্ গীতা ও ধম্মপদকে বিশ্বচিত্তবিজয়ের প্রস্থানত্রয় বলে বর্ণনা করা অসংগত নয়।

বিশ্বমনীষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের এই তিন রত্নের আপেক্ষিক মর্যাদা নির্ণয় করা প্রয়োজন। বৌদ্ধধর্মের লোপের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ধম্মপদের গৌরবও তিরোহিত হয়। বস্তুতঃ খ্রীস্টীয় নবম-দশম শতকের পর এ-দেশে উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কালক্রমে ধম্মপদ নামটি পর্যন্ত তার উৎপত্তিভূমিতেই বিস্মৃত হয়ে যায়। উপনিষদের গৌরব এ-দেশে বরাবরই স্বীকৃত হয়ে আসছে, কিন্তু তার চর্চা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আধুনিক যুগের সূচনাকালে নামগৌরবমাত্রে পর্যবসিত হয়েছিল এ-কথা বললে অন্যায় হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে গীতার গৌরব ও মর্যাদা কখনও হ্রাস পায়নি, বরং যুগে যুগে তার প্রভাব বেড়েই চলেছে। বস্তুতঃ অধুনাপূর্ব কালে গীতাই একমাত্র না হক মুখ্যতম সংস্কৃত গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছিল। ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যখন পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হয় তখন গীতাই তার সর্বপ্রধান প্রতীক বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

গীতা

ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম সংস্কৃতজ্ঞ হচ্ছেন চার্ল্স্ উইলকিন্স্। ওআরেন হেস্টিংসের নির্দেশে তিনি কাশীর পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত শিখে ১৭৮৫ সালে ভগবদ্গীতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই হল ইউরোপীয় ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থের প্রথম অনুবাদ। যা হক, এর পর থেকে আজ পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় গীতা-অনুবাদ ও -চর্চার ধারা অবিশ্রান্তভাবেই চলেছে। ১৮২৩ সালে জরমান পণ্ডিত ভিলহেল্ম্ শ্লেগেল (Wilhelm Schlegel) লাটিন অনুবাদসহ গীতার একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণটির দ্বারাই ভিলহেল্ম্ হুমবোল্ট্ (Wilhelm Humboldt) গীতার প্রতি অনুরক্ত হন। এই জরমান মহাপণ্ডিত কতখানি গীতাভক্ত হয়েছিলেন তা তাঁর নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি উক্তি থেকেই প্রতিপন্ন হবে।—

I read the Indian poem for the first time in the country in Silesia, and my constant feeling, while doing so, was gratitude to Fate for having permitted me to live long enough to become acquainted with this book. ··It is perhaps the deepest and loftiest thing the world has to show. This episode of the Mahabharata is the most beautiful, nay perhaps even the only truly philosophical poem which we can find in all the literatures known to us.

'এই ভারতীয় কাব্যটি আমি প্রথম পড়ি সাইলেসিয়ার পল্লীবাসে এবং পড়তে পড়তে ভাগ্যদেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় ভরে উঠছিল, কেননা তাঁর প্রসাদে আমি এই বই পড়বার সুযোগ পাওয়া

পর্যন্ত বেঁচে রয়েছি। পৃথিবীর গভীরতম ও উচ্চতম চিন্তার পরিচয় সম্ভবতঃ এখানেই। যত সাহিত্য আমরা জানি তার মধ্যে মহাভারতের এই কাহিনীটিই সুন্দরতম, এবং সম্ভবতঃ যথার্থ দার্শনিক কাব্যও এখানিই।'

গীতার বহু ইংরেজি অনুবাদের মধ্যে এড্‌উইন আরনোল্‌ডের অনুবাদটি (*The Song Celes'ial*, ১৮৮৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিলাতে বাসকালে এই অনুবাদ পড়েই মহাত্মা গান্ধী গীতার সহিত প্রথম পরিচিত হন এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হন। গান্ধীজির উপরে গীতার প্রভাব কতখানি তা বলা বাহুল্য। গীতার উক্ত অনুবাদ সম্বন্ধে তিনি বলেন,—

I have read almost all the English translations of it, and I regard Sir Edwin Arnold's as the best. He has been faithful to the text and it does not read like a translation.

—***My Experiments with Truth* (1927), p. 165**

'আমি গীতার প্রায় সব ইংরেজি অনুবাদই পড়েছি; আরনোল্‌ডের অনুবাদই আমার কাছে সবচেয়ে ভালো মনে হয়। এতে মূল পাঠ খুব যথাযথ ভাবেই অনুসৃত হয়েছে, অথচ তাতে অনুবাদের কৃত্রিমতাও নেই।'

উপনিষদ্

ইউরোপে উপনিষদের ভক্তেরও অভাব হয়নি। সপ্তদশ শতকে মোগল সম্রাট্ শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকো উপনিষদের ফারসি অনুবাদ করেন। উনবিংশ শতকের আরম্ভেই পেরোঁ (Perron) নামক একজন সাধুপ্রকৃতির ফরাসি পণ্ডিত এই ফারসি অনুবাদ থেকে উপনিষদের লাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন (১৮০১-০২)। এই লাটিন অনুবাদ

পড়েই জরমান দার্শনিক শেলিং (Schelling) এবং শোপেনহাউএর (Schopenhauer) বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। শোপেনহাউএর তো উপনিষদের অতিমাত্র ভক্তই হয়ে ওঠেন। তিনি এই গ্রন্থকে শুধু মানবজ্ঞানের চরম অভিব্যক্তি (fruit of the highest human knowledge and wisdom) বলেই নিরস্ত হননি। প্ল্যাটো কান্ট্ এবং উপনিষদ্কে এক পর্যায়ে ফেলে এই তিনকেই তিনি তাঁর গুরু বলে বর্ণনা করেছেন। বস্তুতঃ এই উপনিষদ্ই ছিল শোপেনহাউএরের গ্রন্থ-সাহেব। তাঁর টেবিলে এই গ্রন্থ নিয়তই খোলা থাকত এবং প্রতি রাত্রিতে শয়নের পূর্বে এই গ্রন্থগুরুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। উপনিষদ্ সম্বন্ধে এই জরমান দার্শনিকের অভিমত ইতিহাসবিখ্যাত হয়ে আছে।—

It is the most satisfying and elevating reading which is possible in the world ; it has been the solace of my life and will be the solace of my death.

'পৃথিবীতে উপনিষদ্ পড়ার চেয়ে আনন্দজনক ও চিত্তোন্নয়নকর আর কিছুই হতে পারে না। এতেই পেয়েছি আমার জীবনের সান্ত্বনা, মৃত্যুর সান্ত্বনাও আমি পাব এর থেকেই।

কোনো ভারতীয় ভক্তের কাছেও উপনিষদ্ এতখানি শ্রদ্ধা পেয়েছে কিনা সন্দেহ। গীতার ভাগ্যে এরূপ অনেক ভক্তই জুটেছে, কিন্তু উপনিষদের এমন ভক্তের কথা জানা যায় না। যা হক, এরূপ ভক্তির আতিশয্য ইউরোপেও আর দেখা যায়নি। কিন্তু এ-কথাও ঠিক যে, ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত ইউরোপে উপনিষদের অনুরাগীরও অভাব ঘটেনি এবং পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার উপরে তার প্রভাবও কিছুমাত্র ক্ষীণ হয়নি। আধুনিক জরমান পণ্ডিত ভিনটারনিট্স বলেন,—

Across the space of thousands of years the Upanishads *still* have *much* to tell *us also.*

—*History of Indian Literature, Vol. I* (1927), *p.* 266

'হাজার হাজার বছরের ব্যবধানেও এখন পর্যন্ত আমাদেরও উপনিষদের কাছে অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে।' এই উক্তিকে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতসমাজের সাধারণ মনোভাবের পরিচায়ক বলে গ্রহণ করা যায়।

ধম্মপদ

গীতা এবং উপনিষদের ন্যায় ধম্মপদও ইউরোপীয় শিক্ষিতসমাজের কাছ থেকে প্রচুর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অর্জন করেছে। তবে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য লুপ্ত হয়ে যাওয়াতে সে শ্রদ্ধা পেতে কিছু বিলম্ব হয়েছে। কিন্তু সিংহলের পালি সাহিত্যের প্রতি পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার পর থেকেই ধম্মপদ অনায়াসেই স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লাটিন, ফরাসি, ইংরেজি, জরমান, ইতালীয়, রুশ প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় ধম্মপদের বহু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সর্বপ্রথম অনুবাদ হয় লাটিন ভাষায় (১৮৫৫)। অনুবাদকর্তা ডেনমার্কের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডক্‌টর ফজবোল (V. Fausboll)। লক্ষ্য করবার বিষয়, গীতা উপনিষদ্ ও ধম্মপদ তিনটিই ইউরোপের দেবভাষা লাটিনে অনূদিত হয় গ্রন্থগুলির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। গীতার প্রথম অনুবাদ হয় ইংরেজিতে, কিন্তু তার পরেই লাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। উপনিষদ্ ও ধম্মপদের প্রথম অনুবাদই লাটিনে। এর থেকেই এই ধর্মগ্রন্থগুলির প্রতি ইউরোপের শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায়। যা হক, ফজবোলের উৎকৃষ্ট সংস্করণটি প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন ভাষায় ধম্মপদ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়। ১৮৮৯ সালে *Sacred Books of the East* নামক বিখ্যাত গ্রন্থমালায় (দশম খণ্ডে)

ম্যাক্‌স্‌মূলরের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তার পর থেকেই এই গ্রন্থের মর্যাদা বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়। সে সময় থেকেই এদিকে ভারতীয় মনস্বীদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে ধম্মপদের স্থান সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ ম্যাকডোনেল (A. A. Macdonell) বলেন—

It is a collection of aphorisms representing the most beautiful, profound and poetical thoughts in Buddhist literature.

—*History of Sanskrit Literature (1900), p, 379*

'বৌদ্ধ সাহিত্যের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে মহৎ ও সবচেয়ে কাব্যময় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ধম্মপদের সুভাষিতসংগ্রহের মধ্যে।'

ম্যাক্‌স্‌মূলরের পর ধম্মপদের অনেক ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে অধ্যাপক আলবার্ট জে. এডমণ্ডস (Edmunds)-এর অনুবাদ (*Hymns of the Faith,* শিকাগো, ১৯০২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অনুবাদের ভূমিকায় গ্রন্থকার ধম্মপদ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা এস্থলে উদ্‌ধৃত করছি।

If ever an immortal classic was produced on the continent of Asia it is this.·· These old refrains from life beyond time and sense, as it was wrought out by generations of earnest thinkers, have been fire to many a muse.·· And to-day after twenty centuries of Roman and Christian culture, they have won the admiration of Europeans and Americans in every seat of learning from Copenhagen to the Cambridges and from Chicago to St. Petersburg.

—*Hymns of the Faith (1902),* ভূমিকা

'এশিয়া মহাদেশে যদি কোনো অমর মহাকাব্য কখনও রচিত হয়ে

থাকে তবে সেটি হচ্ছে এই ধম্মপদ। ভারতের ঋষিমনীষীরা যুগ যুগ ধরে যে অতীন্দ্রিয় মহাজীবন গড়ে তুলেছিলেন সেই জীবনের এই চিরন্তন বাণীসমূহ কত হৃদয়ে যে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে তার ইয়ত্তা নেই। দু হাজার বছরের রোমক ও খ্রীস্টান সংস্কৃতির পরে আজও সেই বাণী কোপেনহেগেন থেকে ক্যামব্রিজ এবং শিকাগো থেকে সেণ্টপিটার্সবার্গ (আধুনিক লেলিনগ্রাড) পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের শ্রদ্ধা অর্জন করছে।'

ধম্মপদ সম্বন্ধে এডমণ্ডস সাহেবের এই মন্তব্যকে অত্যুক্তিমাত্র মনে করা সংগত হবে না। ধম্মপদ বস্তুতঃই এশিয়ার মহাকাব্য। আলংকারিকের মাপকাঠিতে অর্থাৎ রঘুবংশ কুমারসম্ভব যে অর্থে মহাকাব্য সে অর্থে তো নয়ই, রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড যে অর্থে মহাকাব্য সে অর্থেও নয়। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি এক-এক দেশ ও জাতির হৃদয় থেকে উদ্ভূত হয়ে এক-একটি জাতীয় জীবনকেই গড়ে তুলেছে, তাই এগুলিকে বলা চলে জাতীয় মহাকাব্য বা ন্যাশন্যাল এপিক। ধম্মপদও ভারতবর্ষের মর্মকোষ থেকে উদ্গত হয়ে আমাদের জাতীয় জীবনকে নানাভাবে পরিপূর্ণতা দান করেছে। কিন্তু এখানেই তার সার্থকতা শেষ হয়নি। ভারতবর্ষের হৃদ্‌কেন্দ্র থেকে যাত্রা করে সে অগ্রসর হয়েছে বিশ্বচিত্তবিজয়ে। নদীপর্বতসমুদ্র লঙ্ঘন করে ধম্মপদ দেশে দেশে মানুষের চিত্তে বিস্তার করেছে আপন অধিকার। সুকুমার কাব্যের মতো শুধু রসিকজনের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করাই তার লক্ষ্য নয়, এক-একটি সমগ্র জাতির হৃদয়কে আয়ত্ত করাই ছিল তার ব্রত। আর, শুধু ভাবের ক্ষেত্রে উপভোগের বস্তু হয়ে থাকে যে কাব্য, ধম্মপদ সেই শ্রেণীর কাব্যও নয়। মানুষের সমগ্র জীবনকে সর্বাঙ্গীণভাবে বিকশিত করে তোলার মধ্যেই এই কাব্যটির সার্থকতা। এশিয়া মহাদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে সমষ্টিগত জাতীয় মহাজীবন গড়ে উঠেছিল, ধম্মপদকেই

তার প্রেরণাস্থল বলে বর্ণনা করলে অন্যায় হয় না। সিংহল থেকে মোঙ্গোলিয়া এবং মধ্যএশিয়া থেকে যবদ্বীপ পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে এক মহাজাতীয় জীবন গড়ে তোলার ব্যাপারে ধম্মপদের দান অপরিসীম, তার ইতিহাস তুলনাহীন। এই মহাজনতার সমগ্র জীবনে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি যে চিরন্তন মাধুর্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে, কোনো মহাকাব্যেরই সে সৌভাগ্য ঘটেনি। অথচ আকৃতি বা প্রকৃতিতে মহাকাব্যের কোনো লক্ষণই এটির নেই। বাহ্য লক্ষণের বিচারে ধম্মপদকে বলতে হয় নীতিকাব্য, আর রসরচনা হিসাবে এর স্থান গীতিকবিতার সমপর্যায়ে।' মূলতঃ নীতিকাব্য হলেও ধম্মপদের প্রভাব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। এখানেই ধম্মপদের বিশেষ গৌরব। এর কারণ হচ্ছে একদিকে তার গভীরতা ও উদারতা এবং অপরদিকে তার সর্বকালীনতা ও বিশ্বজনীনতা।

এক হিসাবে একমাত্র খ্রীস্টান বাইবেলের সঙ্গেই তার তুলনা হতে পারে, পৃথিবীর আর কোনো গ্রন্থের সঙ্গে এর তুলনা হয় না। বাইবেল মহাকাব্য বলে গণ্য না হলেও ইউরোপের জাতীয় জীবনের পক্ষে মহাকাব্যের আসনেই তার স্থান। বাইবেলের সঙ্গে ধম্মপদের পার্থক্য এই যে, বাইবেল বিশেষ কালের ভূমিকায় বিশেষ সম্প্রদায়ের উপযোগী করেই রচিত, কিন্তু ধম্মপদ বৌদ্ধ সাহিত্য হলেও তার সুর এবং ব্যঞ্জনা মূলতঃই অসাম্প্রদায়িক। সর্বকালের সর্বমানবের জীবনপ্রতিষ্ঠ এমন কাব্য আর একটিও নেই।

উপনিষদ্ এবং গীতার বাণীও প্রধানতঃ অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু ওই দুটি গ্রন্থেরই এমন একটি পরিবেশ আছে যা সর্বকালে সর্বজনের স্বীকার্য নয়। তা ছাড়া গীতা ও উপনিষদ্ যে অংশে সর্বজনীন সে অংশেও তা এমন কতকগুলি তত্ত্ব ও রহস্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত যা সকলের পক্ষে সমভাবে অধিগম্য নয় এবং অধিগম্য হলেও সমভাবে স্বীকার্য

নয়। ধম্মপদ কিন্তু প্রায় সম্পূর্ণরূপেই তত্ত্ববিচারনিরপেক্ষ, তাই সকলের হৃদয়কেই প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করার পক্ষে কোনো অন্তরায় নেই। এই প্রসঙ্গে ধম্মপদের অনুবাদক সন্‌ডার্স (K J. Saunders) বলেন—

Mysticism finds no entrance here—a fact which makes the Dhammapada almost unique amongst the great things of religious literature. Instead we find common sense supreme,·· confident of itself and of its firm grasp of all the factors in life's equation.

—*The Buddha's Way of Virtue (1912)*, ভূমিকা পৃ ১৬

'ধম্মপদে রহস্য- বা তত্ত্ব-বিচারের কোনো স্থান নেই। তার ফলে এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে একটি অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা পেয়েছে। তত্ত্ববিচারের পরিবর্তে এটিতে পাই নিছক সাধারণ বুদ্ধির অব্যাহত প্রয়োগ যা আত্মপ্রত্যয় এবং জীবনের সর্ববিধ বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত।'

আত্মা ও ব্রহ্মের তত্ত্বসন্ধানই উপনিষদের প্রাণবস্তু। তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিষ্ঠা না হলে জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা সম্ভব নয়, এই মত উপনিষদে স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকৃত। গীতার আদর্শও অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কেন না, গীতাও আসলে উপনিষদ্‌, তার পূরো নাম (ভগবদ্‌গীতোপনিষৎ) থেকেই তা স্বপ্রকাশ। কিন্তু ধম্মপদ স্বরূপতঃ উপনিষদ্‌ নয়, অর্থাৎ অধ্যাত্মনিষ্ঠা এর প্রকৃতিগত নয়। তত্ত্ববিদ্যানিরপেক্ষভাবে শুধু আচরণসাধ্য জীবননীতির আদর্শে সর্ব-মানবকে সার্থকতার পথে প্রবর্তিত করাই এর লক্ষ্য। এই বিশিষ্টতাই ধম্মপদকে বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাসে এক অপূর্ব স্বাতন্ত্র্যমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ধম্মপদের এই বলিষ্ঠ নীতিপরায়ণতার একমাত্র তুলনাস্থল হচ্ছে ভারতবর্ষের সর্বত্রব্যাপ্ত প্রিয়দর্শী অশোকের ধর্মানুশাসনসমূহ।

৫

ধম্মপদের জয়যাত্রা

ধম্মপদের এই তত্ত্বনিরপেক্ষ সরল নীতিনিষ্ঠতাই তার জনচিত্তপ্রবেশের পথকে সুগম করেছিল। পক্ষান্তরে তত্ত্বপ্রধান অধ্যাত্মনিষ্ঠতাই গীতা ও উপনিষদ্‌কে জনসাধারণের অধিকারের উর্ধ্বে মনস্বিতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। তা ছাড়া যে জনকল্যাণের প্রবর্তনা ধম্মপদকে হিমালয়পর্বত ও ভারতসমুদ্র লঙ্ঘন করে মহাদেশ জয়ে নিয়োজিত করেছিল, উপনিষদ্ ও গীতার মধ্যে সে প্রেরণা নেই। তাই দেখতে পাই, আধুনিক যুগের মনস্বীদের বুদ্ধিবৃত্তিকে গভীরভাবে নাড়া দিলেও গীতা-উপনিষদ্ প্রাচীনকালের মানবহৃদয়কে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারেনি। কিন্তু ধম্মপদ প্রাচীন ও আধুনিক উভয়কালের মানুষকেই অনায়াসেই জয় করতে পেরেছে। একাদশ শতকের প্রথম ভাগে তুরকি মহাপণ্ডিত আবু রইহান অলবেরুনি (৯৭৩-১০৪৮) গীতার তত্ত্বগৌরবের দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং নানাপ্রসঙ্গে গীতার অনেক অংশেরই অনুবাদ করেন। তারপরেও মুসলমান পণ্ডিতেরা গীতার গৌরবে আকৃষ্ট হন এবং তার ফারসি অনুবাদও করেন। কিন্তু তৎকালীন পণ্ডিতসমাজের বাইরে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে গীতা কোনো আলোড়ন জাগাতে পারেনি। উপনিষদ্ সম্বন্ধেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। মধ্যযুগের সুফী দার্শনিকদের তত্ত্বচিন্তাধারার উপরে উপনিষদের পরোক্ষ প্রভাব যথেষ্টই আছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। ওই সীমার বাইরে তার প্রভাব বিস্তারের কোনো নিদর্শন নেই।

কিন্তু ধম্মপদের বিশ্ববিজয়-অভিযানের সূচনা হয় ওই গ্রন্থ সংকলনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। অশোকের পুত্র (বা ভ্রাতা) মহেন্দ্র যখন বুদ্ধের বাণী নিয়ে সিংহলে যান, ধম্মপদও তখনই সেখানে প্রচারিত হয় বলে

সিংহলীদের বিশ্বাস। সেখান থেকে তার প্রভাব প্রসারিত হয় ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশে। ওই তিন বৌদ্ধদেশে প্রথম প্রচারের সময় থেকে এখন পর্যন্ত ধম্মপদের চর্চা অবিশ্রান্ত ভাবেই চলেছে। প্রত্যেক বৌদ্ধকেই উপসম্পদা অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণকালে এই গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করতে হয়। বস্তুতঃ বৌদ্ধ দেশগুলিতে এই পুস্তক আগাগোড়া আবৃত্তি করতে পারেন এরূপ লোকের সংখ্যা করা যায় না। সিংহল ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশে পালি ধম্মপদই প্রচলিত এবং পালিশিক্ষার্থীর পক্ষে এরূপ উপযোগী গ্রন্থ আর নেই। সেজন্যও ওসব দেশে এই গ্রন্থের এত সমাদর।

যে গ্রন্থের সমাদর ও প্রভাব এত বেশি এবং যে গ্রন্থ প্রাচীন কাল থেকেই বহু বিভিন্ন দেশে বিজয়যাত্রা শুরু করেছে তার পক্ষে শুধু এক ভাষাতেই আবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়, নানা ভাষায় তার বেশপরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ধম্মপদেরও তাই হয়েছে। পালি ধম্মপদ সংকলনের অনতিকাল পরেই (সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই) সংস্কৃত ভাষায় তার রূপান্তর ঘটে। প্রথমে যে সংস্কৃতে ধম্মপদের ভাষান্তর হয় সে হচ্ছে ভাঙা সংস্কৃত। এই ভাঙা সংস্কৃতে রচিত একাধিক ধম্মপদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায়ও ধম্মপদ একাধিক বার রূপান্তরিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ভাঙা সংস্কৃত অবলম্বন করে ২২৩ খ্রীস্টাব্দে চীনাভাষায় ধম্মপদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর চীনাভাষায় ধম্মপদের অনুবাদ হয় আরও অন্ততঃ তিনবার। শেষ অনুবাদ হয় সম্ভবতঃ দশম শতকের শেষ ভাগে (৯৮০-১০০১)। শুধু সংস্কৃত নয়, প্রাকৃতেও যে ধম্মপদের অনুবাদ হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। মধ্যএশিয়ার খোটান অঞ্চলে গোশৃঙ্গবিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত ধম্মপদের একটি খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়েছে। পণ্ডিতদের মতে এটিই সম্ভবতঃ প্রাচীনতম ভারতীয় পাণ্ডুলিপি, এর ভাষা গন্ধার জনপদের (রাওলপিণ্ডি অঞ্চলের) তৎকালপ্রচলিত প্রাকৃত

এবং এর রচনাকাল খ্রীস্টজন্মের কাছাকাছি কোনো সময়ে। মধ্যএশিয়ার তুরফান অঞ্চলেও ধম্মপদের একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। এর ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত এবং এর লিপি উত্তর-গুপ্তযুগের (ষষ্ঠ-সপ্তম শতক) ব্রাহ্মী। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই বিশেষ সংস্কৃত সংস্করণটিই পরবর্তী কালে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। সম্ভবতঃ তিব্বতরাজ রল-প-চনের (৮১৭-৪২) রাজত্বকালে পণ্ডিত বিদ্যাপ্রভাকর এই অনুবাদ করেন। নেপালেও ধম্মপদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি অশোকের রাজত্বকাল (খ্রী-পূ ২৭২-৩২) থেকে ধম্মপদের যে বিশ্ববিজয়-যাত্রা শুরু হয় খ্রীস্টীয় দশম শতকেও তার গতি ব্যাহত হয়নি। বস্তুতঃ অশোক যে বিশ্বব্যাপী ধর্মবিজয়-অভিযান আরম্ভ করেন, পরবর্তী কালে তারই পতাকাবহনের গুরুদায়িত্ব পড়ে ধম্মপদের উপরে। ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে বিচার করলে অনায়াসেই বোঝা যায় যে, অশোকের আরব্ধ কার্য সমাপনের ব্রত নিয়েই ধম্মপদের যাত্রা শুরু হয়। অশোকের ধর্মবিজয় প্রধানতঃ পশ্চিম ভূখণ্ডেই আবদ্ধ ছিল। বাকি তিন দিক্ বিজিত হয় ধম্মপদের দ্বারা। মৌর্য আমলে যে ধর্ম-বাহিনী বিজয়-অভিযানে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল তার পৃষ্ঠরক্ষা করে স্বয়ং অশোকের চরিত্রমহিমা, আর পরবর্তী কালে যেসব বাহিনী বিভিন্ন দিকে ধর্মবিজয়ে অগ্রসর হয় তার পুরোভাগেই ছিল ধম্মপদের বাণীগৌরব। ভারতবর্ষ যখন যবনশকপহ্লব এবং হূণগুর্জরতুরকির পুনঃপুনঃ আক্রমণের বিপ্লবে পর্যুদস্ত হচ্ছিল তখনও ধম্মপদের ধর্মাভিযান ব্যাহত হয়নি। দুর্ধর্ষ তুরকি সুলতান মামুদ (৯৯৭-১০৩০) যখন উত্তর-ভারতবর্ষকে ছিন্নভিন্ন করছিলেন তখনও একদিকে চলছিল ধম্মপদের চীনা অনুবাদ এবং অপরদিকে বুদ্ধের মৈত্রীবাণী নিয়ে হিমালয় লঙ্ঘন করে তিব্বতজয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন নালন্দা মহাবিহারের মহাস্থবির বৃদ্ধ দীপংকর। ধম্মপদের এই প্রভাববিস্তারের ফলে একদিকে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম এবং অপর দিকে

মধ্যএশিয়া, নেপাল, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে বুদ্ধের বাণী স্বীকৃত হয়েছিল। এভাবে ধম্মপদ যে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অর্জন করেছে সে কথা ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া এবং শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রাকৃত ধম্মপদ নামক গ্রন্থে অতি স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে।

The history of the Dhammapada literature covers some twelve centuries from the fourth century B. C. to the ninth century A. D. The Dhammapada texts have an *international importance*, for it is through them that the lofty messages of Buddhism could be appealed to the various nations of Asia.

—*Prakrit Dhammapada* (1921), *p. liv*

'ধম্মপদসাহিত্যের খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রীস্টীয় নবম শতক পর্যন্ত বারো শো বছর ব্যাপী ইতিহাস আছে। তা ছাড়া তার আন্তর্জাতিক গুরুত্বও আছে, কেননা এই ধম্মপদের সাহায্যেই বৌদ্ধ ধর্মের মহৎ বাণী এশিয়ার বিভিন্ন জাতির হৃদয় স্পর্শ করেছিল।'

আন্তর্জাতিক গুরুত্বের বিচারে ধম্মপদের সঙ্গে ভারতবর্ষের আর কোনো গ্রন্থেরই তুলনা হয় না। গীতা-উপনিষদ্‌ও কোনো কালেই ধম্মপদের ন্যায় বিভিন্ন জাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করতে পারেনি। আধুনিক কালে অবশ্য গীতা-উপনিষদ্ পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে ; কিন্তু এশিয়ার দেশগুলিতে সে মর্যাদা এখনও পায়নি। ধম্মপদও আধুনিক ইউরোপীয় হৃদয়কে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে, আর এশিয়ার জাতিসমূহের হৃদয়ে তার প্রতিষ্ঠা চিরকালের। চারুচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁর সম্পাদিত ধম্মপদের ভূমিকায় (১৯০৪) লিখেছেন, "সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন, জাপান ও তিব্বত দেশে ভক্তির সহিত এই গ্রন্থ পঠিত হয়"। বস্তুতঃ এই গ্রন্থের দ্বারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্য কোনো গ্রন্থের দ্বারাই তা হয়নি। এই হিসাবে ধম্মপদকেই ভারতবর্ষের সর্বোত্তম গ্রন্থ বলে অভিহিত করা যায়।

ধম্মপদ গ্রন্থে পুষ্পবর্গের প্রথমেই আছে—

১ কো ইমং পঠবিং বিজেস্‌সতি যমলোকং চ ইমং সদেবকং।
কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্‌ফমিব পচেস্‌সতি ॥৪৪

২ সেখো পঠবিং বিজেস্‌সতি যমলোকং চ ইমং সদেবকং।
সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্‌ফমিব পচেস্‌সতি ॥৪৫

'কে এই পৃথিবী এবং যমলোক ও দেবলোক জয় করবে? নিপুণ মালাকর যেমন (উত্তম) ফুল বেছে নেয়, তেমনি করে কে এই সুদেশিত (সুপ্রদর্শিত বা সু-উপদিষ্ট) ধম্মপদ (ধর্মপথ বা ধর্মবাণী) বেছে নেবে? (উপযুক্ত) শিষ্যই এই যমলোক, দেবলোক ও পৃথিবী জয় করবে। সে-ই নিপুণ মালাকরের মতো সুদেশিত ধর্মের পথ (বা পদ) বেছে নেবে।'

এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, যিনি সুদেশিত ধর্মের পথ (বা বাণী) বেছে নেবেন তিনিই পৃথিবী জয় করতে পারবেন। বস্তুতঃ ধর্মের পথে বিশ্ববিজয়ের আদর্শ ও কামনা এক সময়ে ভারতবর্ষের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করেছিল। তার পরিচয় পাই ধম্মপদ গ্রন্থে, তার প্রমাণ দেখি অশোকের অনুশাসনগুলিতে। রাজভিক্ষু অশোক একদিন সুযোগ্য শিষ্যের মতো সুদেশিত ধর্মের পথ বেছে নিয়েছিলেন ; আর ধর্মপথিক অশোকই সে-যুগে ভারতবর্ষের হয়ে পৃথিবী জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অতঃপর দীর্ঘকাল ধরে ধর্মের পথে বিশ্ববিজয়ের প্রেরণা জুগিয়েছে এই ধম্মপদ গ্রন্থ। সেই প্রেরণাতেই চীনবর্ষ জয় করতে অগ্রসর হয়েছিলেন কাশ্যপ মাতঙ্গ (খ্রী-অব্দ ৬৫), কুমারজীব (চীনে ৩৮৩ থেকে ৪১২) প্রভৃতি ধর্মপথিকগণ, যবদ্বীপ জয় করলেন কাশ্মীররাজপুত্র ভিক্ষু গুণবর্মা (৩৬৬-৪৩১ ; মৃত্যু চীনের নানকিং নগরীতে), আর তিব্বতজয়ে অভিযান করলেন ধর্মপথিক দীপংকর শ্রীজ্ঞান (৯৮০-১০৫৩ ; তিব্বতবাস ১০৪০-৫৩)। এর থেকে বোঝা যায় কত বড় শক্তির আধার এই স্বল্পায়তন পুস্তকখানি। একথা মনে রাখলে ভারতবর্ষের এই ক্ষুদ্রতম ধর্ম্মগ্রন্থটিকেই স্থান দিতে হয় গৌরবের মহত্তম আসনে।

৬

ধম্মপদের পুনরভ্যুদয়

দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থরত্ন মধ্যযুগের ভারতবর্ষে শুধু যে অনাদৃতই হয়েছিল তা নয়, সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হয়েছিল। এই বিস্মরণের অন্যতম কারণ সম্ভবতঃ ও গ্রন্থের ভাষা। ভারতবর্ষে ধর্মগ্রন্থের স্বাভাবিক বাহন সংস্কৃত ভাষা। কোনো অ-সংস্কৃত ভাষার পক্ষে সংস্কৃতের সমান মর্যাদা লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—সে ভাষা "প্রদেশবিশেষে বদ্ধ, শিক্ষিতমণ্ডলীকর্তৃক উপেক্ষিত এবং কালে কালে তাহা পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। সে ভাষায় যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা কোনো স্থায়ী ভিত্তি পান নাই। নিঃসন্দেহ অনেক বড় বড় সাহিত্যপুরী চলনশীল পলিমৃত্তিকার মধ্যে নিহিত হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেছে" (কাদম্বরীচিত্র, প্রাচীন সাহিত্য)। ধম্মপদও অদৃশ্য হতে হতে সৌভাগ্য ক্রমে রক্ষা পেয়ে গেছে। এইজন্যই ধম্মপদ সম্বন্ধে ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী বলেছেন, "যদি পালি ভাষায় রচিত না হয়ে সংস্কৃতে রচিত হত, তাহলে এ গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মতোই সমাদর পেত" (ভিক্ষু শীলভদ্র-সম্পাদিত ধম্মপদ পুস্তকের মুখবন্ধ)।

যা হক, দীর্ঘকাল পরে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা সিংহল থেকে এই বিস্মৃত গ্রন্থের উদ্ধার সাধন করেন। আর, ১৮৮৯ সালে ম্যাক্‌স্‌মূলরের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর এই গ্রন্থের প্রতি আমাদের বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত এদিকে আমাদের মন যথোচিতভাবে নিবিষ্ট হয়নি। আর, বাংলা ভাষায় তো ধম্মপদের আলোচনা খুবই কম হয়েছে। বোধ করি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম' নামক গ্রন্থে (১৯০২, দ্বিতীয় সং ১৯২২) ধম্মপদ সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন (পৃ ১৩৮-১৫০)। এই উপলক্ষ্যে তিনি উক্ত

গ্রন্থে ধম্মপদের অনেকগুলি শ্লোকের গদ্য ও পদ্য অনুবাদ প্রকাশ করেন। বাংলা সাহিত্যে ধম্মপদের আলোচনাপ্রসঙ্গে এই অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধম্মপদ তথা বৌদ্ধধর্মের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের এই আকর্ষণ আকস্মিক নয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫০ সালে ব্রহ্মদেশে যান, কিন্তু সেখানকার বৌদ্ধধর্ম তাঁর মনে কোনো রেখাপাত করেনি। কিন্তু ১৮৫৯ সালে যখন সিংহলভ্রমণে যান তখন সেখানকার বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর মন সচেতন হয়ে উঠেছিল। এই সিংহলভ্রমণের সময়ে আঠারো বছরের যুবক সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন পিতার সঙ্গী। এই সময়েই তাঁর তরুণ মন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে এ বিষয়ে ঔৎসুক্য অর্জন করে। তার কিছু পরেই (১৮৬২ মার্চ) বিলেত গিয়ে তিনি ভারততত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ম্যাক্সমূলরের সংস্পর্শে আসেন। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি তথা বৌদ্ধধর্মের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হবেন তা বিচিত্র নয়। যা হক, ১৯০৪ সালে চারুচন্দ্র বসু বাংলা অনুবাদসহ ধম্মপদের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। শুধু বাংলায় নয়, বোধ করি আধুনিক ভারতীয় ভাষাতে এটিই ধম্মপদের প্রথম অনুবাদ। বইখানি বিশেষ যত্নসহকারে অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। এর প্রথম দুই সংস্করণে (১৯০৪, ১৯০৫) দুটি মূল্যবান্ ভূমিকা লিখে দেন পালি সাহিত্যের স্বনামখ্যাত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়। বস্তুতঃ বাংলায় এখানিই আজ পর্যন্ত ধম্মপদের শ্রেষ্ঠ সংস্করণের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছে। তার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৬ সালে। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণটি স্মরণীয় হয়ে আছে আরও একটি বিশেষ কারণে। চারুবাবুর ধম্মপদ প্রকাশের কিছু পরেই বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) পত্রিকায় (১৩১২ জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের স্থান সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন, আজও তার কিছুমাত্র মূল্যহানি ঘটেনি। তা ছাড়া চারুবাবুর ধম্মপদ

প্রথম সংস্করণের মার্জিনে পালি শ্লোকের পাশে পাশে রবীন্দ্রনাথ তার বাংলা পদ্যানুবাদ লিখে রাখেন। কিন্তু অনুবাদ চতুর্থ বর্গের দশম শ্লোকের বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। পাণ্ডুলিপিটিও নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায় এবং পদ্যানুবাদটিও কবির জীবিতকালে প্রকাশিত হতে পারেনি। কিছুকাল হল পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গিয়েছে এবং উক্ত অনুবাদটি বিশ্বভারতী পত্রিকায় (সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আশা করা যায় রবীন্দ্ররচনার এই বিশেষ দিক্‌টির প্রতি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে।

যা হক, চারুবাবুর গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পরে ধম্মপদের আরও অনেক বাংলা সংস্করণ হয়েছে। এই বইএর অল্পকাল পরেই (১৯০৫ এপ্রিল) হুগলি জেলার কপিলাশ্রম থেকে স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য-কৃত ধম্মপদের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ ও বাংলা গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়।[১] পূর্বোক্ত ধম্মপদং প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটিরও উল্লেখ করেছেন। ধম্মপদের সংস্কৃত পদ্যানুবাদের বিশেষ সার্থকতা আছে। আধুনিক কালে এদেশে খুব কম লোকই পালি জানে বলে মূল ধম্মপদ সকলের পক্ষে সুপরিচিতভাবে মর্মংগম হবার সম্ভাবনা খুবই কম। পক্ষান্তরে সংস্কৃত পদ্যে রূপান্তরিত হলে ভগবদ্‌গীতার মতোই ধম্মপদও সকলের হৃদয়কে প্রত্যক্ষ ও নিবিড় ভাবে স্পর্শ করতে পারবে। এই প্রয়োজনবোধেই প্রাচীন কালেও ধম্মপদ একাধিকবার সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং এই সংস্কৃত ধম্মপদই মধ্যএশিয়া, নেপাল, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হয়েছিল। উক্ত প্রয়োজন আধুনিক ভারতবর্ষে বেড়েছে বই কমেনি। তৎকালে প্রাকৃত ধম্মপদের খুব প্রসার হয়নি; প্রাদেশিক প্রয়োজন

---

১ সম্প্রতি (১৩৫৯ শ্রাবণ) বইখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বে এই গ্রন্থে মূল পালি পাঠ দেওয়া ছিল না। এই সংস্করণে সংস্কৃত পদ্যানুবাদের সঙ্গে মূল পালি পাঠও দেওয়া হয়েছে। তাতে গ্রন্থখানির উপযোগিতা বহুল পরিমাণে বেড়েছে।

মেটানোই ছিল তার লক্ষ্য, বৃহত্তর লক্ষ্য সাধন তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আধুনিক কালেও প্রাদেশিক প্রাকৃত ভাষার অনুবাদগুলি প্রদেশের সীমার মধ্যেই বদ্ধ থাকবে। একমাত্র সংস্কৃত ধম্মপদের পক্ষেই সর্বভারতীয় জনপ্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করা সম্ভব এবং এভাবেই ও-গ্রন্থ গীতার পাশে স্থান নিতে পারে। ধম্মপদের পালিকে সংস্কৃতে পরিণত করাও অতি সহজ। অনেক ক্ষেত্রেই প্রাকৃত শব্দগুলিকে একটু মেজে ঘষে নিলেই সংস্কৃত হয়ে ওঠে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো॥

—ধম্মপদ, যমকবগ্‌গ, ৫

ন হি বৈরেণ বৈরাণি শাম্যন্তীহ কদাচন।
অবৈরেণ চ শাম্যন্তি এষ ধর্মঃ সনাতনঃ॥

—হরিহরানন্দকৃত সংস্কৃত অনুবাদ

বৈর দিয়ে বৈর কভু শান্ত নাহি হয়।
অবৈরে সে শান্তি লভে এই ধর্মে কয়॥

—রবীন্দ্রনাথকৃত বাংলা অনুবাদ

চারুবাবুর সংস্করণেও সংস্কৃত অনুবাদ আছে; কিন্তু পদ্য নয়, গদ্য। হৃদয় অধিকার করার যে সহজশক্তি ছন্দোবদ্ধ ভাষায় আছে, গদ্যের তা নেই। ধম্মপদের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ প্রচারের যথেষ্ট প্রয়োজন এখনও আছে।

বাংলা গদ্যে পদ্যে ধম্মপদের আরও অনুবাদ হয়েছে। বহুকাল পূর্বে যশোহর-খুলনার ইতিহাস-লেখক সতীশচন্দ্র মিত্রের একটি পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। বর্তমানে তা প্রচলিত নেই। ভিক্ষু শীলভদ্র-কৃত সংস্করণটিও (১৩৫১) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এটিই বোধ করি ধম্মপদের শেষ বাংলা সংস্করণ। এটিতে শুধু মূল পালি পাঠ এবং সরল বাংলা গদ্যানুবাদ

আছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এখানি খুবই উপযোগী। বুদ্ধঘোষকৃত ধম্মপদের অর্থকথাও বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধঘোষের মূল পালি ভাষ্য ও তার বাংলা অনুবাদসহ এই পুস্তকটি ত্রিপিটক গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (১৯৩৪)। বাংলা অনুবাদ করেছেন শীলালংকার স্থবির। যাঁরা ধম্মপদ তথা বৌদ্ধ পালি সাহিত্য বিষয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধিৎসু, এই গ্রন্থ বিশেষভাবে তাঁদের জন্য লেখা। সাধারণ পাঠকও এই গ্রন্থ পড়ে উপকৃত হবেন।

শুধু অনুবাদ নয়, ধম্মপদোক্ত নীতি ও আদর্শকে ব্যাখ্যা এবং আলোচনার দ্বারাও জনসাধারণের মনে প্রতিষ্ঠাদানের প্রয়োজনীয়তা আছে। শীলানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রণীত 'অমৃতধারা' গ্রন্থখানির দ্বারা এই প্রয়োজন বহুলাংশে সিদ্ধ হয়েছে। বাংলা অনুবাদের সঙ্গে গ্রন্থকার সহজ ও সরল ভাষায় ধম্মপদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে গ্রন্থোক্ত নীতির আদর্শ উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

হিন্দি সাহিত্যে ধম্মপদের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন-কৃত সংস্করণটিই (১৯৩৩) এ-স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষায় গীতার যত চর্চা হচ্ছে তার তুলনায় ধম্মপদের আলোচনা খুবই সামান্য। অথচ ভারতবর্ষের বাইরে উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের দেশগুলিতে ধম্মপদের চর্চা আজও অবিশ্রান্ত গতিতেই চলেছে, ইউরোপ-আমেরিকায়ও তার আদর কম নয়। বাইরের সঙ্গে ঘরের এই যে বিচ্ছেদ, ভারতবর্ষের পক্ষে তার পরিণাম হয়েছে অতি শোচনীয়। কিন্তু এই শোচনীয়তা সম্বন্ধে আমরা যে কিছুমাত্র সচেতন নই সেটাই সব চেয়ে বড় পরিতাপের বিষয়।

ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় ধম্মপদের অনুবাদ ও আলোচনা যে কত প্রকাশিত হয়েছে তার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় খণ্ডের মনীষীরাই এই মহৎ কাজে সমান উৎসাহ

দেখিয়েছেন। তার মধ্যে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-কৃত সংস্করণটি (১৯৫০) নানাভাবেই বিশিষ্টতার অধিকারী। এই গ্রন্থে পালি মূলপাঠের সঙ্গে অতি সুন্দর ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া আছে। কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান্ হচ্ছে এর বিস্তৃত ভূমিকাটি এবং প্রয়োজনমতো গ্রন্থকারকৃত টীকাগুলি। এই ভূমিকা ও টীকাগুলিতে সর্বপল্লীর অসামান্য মনস্বিতার পরিচয় ভাস্বর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই সংস্করণের দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বজনীন রূপটি আধুনিক বিশ্বমনের কাছে পূর্ণ গৌরবে প্রকাশিত হবার সুযোগ পেল, এটাই সব চেয়ে বড় লাভ।

কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্‌ফমিব পচেস্‌সতি ?

নিপুণ মালাকর যেমন পুষ্প প্রচয়ন করে, তেমনি ক'রে কে ধম্মপদ প্রচয়ন করবে ?

ধম্মপদ-প্রচয়

ধম্মপদ নামটির অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। পালিতে পদ শব্দে পথও বোঝায় (যেমন অপ্রমাদবর্গের প্রথম শ্লোকে), আবার কখনও বাক্য বা বাণীও বোঝায় (যেমন সহস্রবর্গের তৃতীয় শ্লোকে)। সুতরাং ধম্মপদ শব্দে ধর্মপথ ও ধর্মপদাবলী দুই-ই বোঝাতে পারে। পুষ্পবর্গের প্রথম দুই শ্লোকে[১] 'ধম্মপদ' কথাটি পাওয়া যায়; সেখানেও এ কথাটিকে ওই দুই অর্থের যে-কোনো অর্থেই গ্রহণ করা যায়।

পালি ধম্মপদ ২৬ বর্গে বিভক্ত এবং তার শ্লোকসংখ্যা ৪২৩।[২] গীতার অধ্যায়সংখ্যা ১৮ এবং শ্লোকসংখ্যা ৭০০। বোধ করি ধম্মপদই পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ধর্মগ্রন্থ। অথচ তার প্রভাব অপরিসীম। এস্থানে আমরা প্রতিবর্গ থেকে কয়েকটি করে বেছে নিয়ে প্রায় সত্তরটি ধম্মপদের মূলপাঠ ও বাংলা অনুবাদ দিলাম। আশা করি তার থেকেই এ গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করা যাবে। দেখা যাবে মানবচরিত্র সম্বন্ধে ধম্মপদ-উপদেষ্টার দৃষ্টি কত গভীর ও উদার এবং তাঁর প্রেরণা কেমন অমোঘ। আরও দেখা যাবে এই সামান্য গ্রন্থের যুক্তিতর্কহীন তত্ত্বনিরপেক্ষ সরল ও স্বাভাবিক মাধুর্য স্থানে স্থানে কেমন অপূর্ব ও অকৃত্রিম কাব্য-সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে। অর্থবোধের সহায়তার জন্যে স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্ত টীকা দেওয়া গেল। আর, প্রয়োজনমতো স্থলে স্থলে কিছু কিছু সদৃশ উক্তিও উদ্‌ধৃত করে দিলাম। আশা করি তাতে ধম্মপদের সর্বজনীন ভারতীয় প্রকৃতি উপলব্ধির সহায়তা হবে।

১ দ্রষ্টব্য পৃ ৪১

২ পালি ধম্মপদ থেকে চৈনিক ও তিব্বতী ধম্মপদের কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। চৈনিক সংস্করণে তেরোটি বর্গ ও অনেকগুলি শ্লোক বেশি আছে। তা সত্ত্বেও পালি, চৈনিক ও তিব্বতী ধম্মপদ মূলতঃ এবং বস্তুতঃ একই।

১। যমকবর্গ

৫ ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ॥৫

বৈর দ্বারা বৈর কখনও প্রশমিত হয় না, অবৈর দ্বারাই বৈর প্রশমিত হয়; এই সনাতন ধর্ম।

১৯ বহুং পি চে সংহিতং ভাসমানো
ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো।
গোপো ব গাবো গণয়ং পরেসং
ন ভাগবা সামঞ্‌ঞস্‌স হোতি ॥১৯

কোনো গোপ যেমন পরের গোরু গণনা করেই তার (দুধের) অধিকারী হয় না, যে প্রমত্ত ব্যক্তি বহু সংহিতা (শাস্ত্রবাক্য) আবৃত্তি করে অথচ তদনুরূপ আচরণ করে না সেও তেমনি শ্রামণ্যের অধিকারী হয় না।

২০ অপ্পং পি চে সহিতং ভাসমানো
ধম্মস্‌স হোতি অনুধম্মচারী।
রাগং চ দোসং চ পহায় মোহং
সম্মপ্পজানো সুবিমুত্তচিত্তো।
অনুপাদিয়ানো ইধ বা হুরং বা
স ভাগবা সামঞ্‌ঞস্‌স হোতি ॥২০

অল্পমাত্র সংহিতা আবৃত্তি করেও যদি কেউ ধর্মানুচারী হন এবং রাগ দ্বেষ ও মোহ ত্যাগ করে সম্যক্‌-প্রজ্ঞাবান্‌, সুবিমুক্তচিত্ত ও অনুপাদান (অনাসক্ত) হন, তা হলে তিনি ইহলোকে ও পরলোকে শ্রামণ্যের ফলভাগী হন।

তুলনীয়: স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। —গীতা ২।৪০
এই ধর্মের অল্পমাত্রও মহাভয় থেকে ত্রাণ করে।

২। অপ্রমাদবর্গ

১ অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা ॥২১

অপ্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ। অপ্রমত্তের মৃত্যু নেই, যারা প্রমত্ত তারা মৃতবৎ।

তুলনীয় :

১॥ প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি
তথাপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি।
—মহাভারত, উদ্‌যোগ ৪১।৪

আমি প্রমাদকেই বলি মৃত্যু, আর অপ্রমাদকে বলি অমৃত।

২॥ বুদ্ধের বাণী 'অপ্পমাদো খো একো ধম্মো' (কোসল-সংযুত্ত ২।১৮), অপ্রমাদই একমাত্র ধর্ম, এবং তাঁর শেষ উক্তি 'অপ্পমাদেন সম্পাদেথ' (মহাপরিনিব্বাণসুত্ত), অপ্রমাদের দ্বারা কাজ করে যাও।

৩॥ অশোকের বাণী 'খুদকা চ মহাৎপা চ ইমং পকমেয়ু' (প্রথম ক্ষুদ্র গিরিলিপি), ক্ষুদ্র মহৎ সকলেই পরাক্রম (অপ্রমাদ) সহকারে কাজ করুক।

৪ উট্‌ঠানবতো সতিমতো সুচিকম্মস্‌স নিসম্মকারিনো।
সংযতস্‌স চ ধম্মজীবিনো অপ্পমত্তস্‌স যসোঽভিবড্‌ঢতি ॥২৪

যিনি উত্থানবান্ (উদ্যমশীল), স্মৃতিমান্ (কর্তব্যবিস্মৃতিহীন), শুচিকর্মা, নিশাম্যকারী (বিমৃশ্যকারী), সংযত ও ধর্মজীবী, তাঁর যশ বর্ধিত হয়।

নিশাম্যকারী—যিনি অগ্রপশ্চাৎ ও ভালমন্দ ফলাফল বিবেচনা করে কাজ করেন, অর্থাৎ যিনি অবিমৃশ্যকারী নন।

৫ উট্‌ঠানেন'প্পমাদেন সংযমেন দমেন চ।
দীপং কয়িরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি ॥২৫

উত্থান, অপ্রমাদ, সংযম এবং দমের দ্বারা মেধাবী এমন দ্বীপ রচনা করেন যাকে জলস্রোত বিনষ্ট করতে পারে না।

তুলনীয় :

ত্রিনি অমুতপদানি সুঅনুঠিতানি
নয়ংতি স্বগ দম চাগ অপ্রমাদ।
—বেসনগর গরুড়স্তম্ভলিপি

দম ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই তিনটি অমৃতপদ সুঅনুষ্ঠিত হলে স্বর্গলাভ হয়।

৮ পমাদং অপ্পমাদেন যদা নুদতি পণ্ডিতো।
পঞ্‌ঞাপাসাদমারুয্‌হ অসোকো সোকিনিং পজং।
পব্বতট্‌ঠো ব ভুম্মট্‌ঠে ধীরো বালে অবেক্‌খতি ॥২৮

যখন কোনো পণ্ডিত অপ্রমাদের দ্বারা প্রমাদকে অপনোদন করেন, তখন সেই শোকহীন ধীর (ধীমান্, পণ্ডিত) ব্যক্তি প্রজ্ঞাপ্রাসাদে আরোহণ ক'রে, পর্বতস্থ ব্যক্তি ভূমিস্থকে যেভাবে দেখেন, সেভাবেই শোকী ও অজ্ঞদের প্রতি অবলোকন করেন। বাল—অজ্ঞ।

৯ অপ্পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহুজাগরো।
অবলস্‌সং ব সীঘস্‌সো হিত্বা যাতি সুমেধসো ॥২৯

যেমন শীঘ্রগামী অশ্ব দুর্বল অশ্বকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়, মেধাবী ব্যক্তিও তেমনি প্রমত্তদের মধ্যে অপ্রমত্ত এবং সুপ্তদের মধ্যে জাগরূক থেকে (ধর্মের পথে) এগিয়ে যান।

তুলনীয় : যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।—গীতা ২।৬৯

যা সকলের পক্ষে নিশাকাল অর্থাৎ সুপ্তির সময়, তখনই সংযমী জাগরূক থাকেন।

৩। চিত্তবর্গ

১০ দিসো দিসং যন্তং কয়িরা বেরী বা পন বেরিনং।
মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং পাপিয়ো নং ততো করে ॥৪২

দ্বেষ্টা দ্বিষ্টের বা বৈরী বৈরীর যত (ক্ষতি) করে, মিথ্যাপ্রণিহিত (অসত্যনিষ্ঠ) চিত্ত মানুষকে ততোধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে।

১১ ন তং মাতা পিতা কয়িরা অঞ্ঞে বা পি চ ঞাতকা।
সম্মাপণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে ॥৪৩

মাতাপিতা বা অন্য জ্ঞাতিরাও তত (শ্রেয়ঃ) করতে পারেন না; সম্যক্‌প্রণিহিত (সত্যনিষ্ঠ) চিত্ত মানুষের যত শ্রেয়ঃ সাধন করে।

৪। পুষ্পবর্গ

৭ ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং।
অত্তনো ব অবেক্‌খেয্য কতানি অকতানি চ ॥৫০

পরের ত্রুটি বা পরের কৃতাকৃত নয়, নিজেরই কৃত ও অকৃত দেখবে।

৮ যথাপি রুচিরং পুপ্‌ফং বণ্ণবন্তং অগন্ধকং।
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো ॥৫১

রুচির (সুন্দর) ও বর্ণাঢ্য অথচ গন্ধহীন পুষ্প যেমন ব্যর্থ, অনাচরণকারীর সু-ভাষিত বাক্যও তেমনি বিফল হয়।

৯ যথাপি রুচিরং পুপ্‌ফং বণ্ণবন্তং সগন্ধকং।
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি কুব্বতো ॥৫২

রুচির, বর্ণাঢ্য এবং সুগন্ধ পুষ্প যেমন সার্থক, আচরণকারীর সু-ভাষিত বাক্যও তেমনি সফল হয়।

১০ যথাপি পুপ্‌ফরাসিম্‌হা কয়িরা মালাগুণে বহু।
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং ॥৫৩

যেমন পুষ্পরাশি থেকে বহুবিধ মালা করা হয়, মর্ত্য মানুষেরও তেমনি উচিত বহুবিধ কুশলকর্ম করা।

১১ ন পুপ্‌ফগন্ধো পটিবাতমেতি
ন চন্দনং তগরং মল্লিকা বা।

সতং চ গন্ধো পটিবাতমেতি
সব্বা দিসা সপ্পুরিসো পবাতি ॥৫৪

পুষ্পগন্ধ বায়ুব প্রতিকূলে যায় না,— চন্দন তগর বা মল্লিকার গন্ধও না ; সৎ লোকের গন্ধ কিন্তু বায়ুর প্রতিকূলেও যায়। সৎপুরুষ সমস্ত দিক্‌কেই প্রভাবিত করে।

৫। বালবর্গ

৪ যো বালো মঞ্‌ঞতি বাল্যং পণ্ডিতো বাপি তেন সো।
বালো চ পণ্ডিতমানী স বে বালো তি বুচ্চতি ॥৬৩

যে অজ্ঞ নিজের অজ্ঞতা জানে, সে তাতেই পণ্ডিত হয় ; আর যে অজ্ঞ নিজেকে পণ্ডিত মনে করে, তাকেই যথার্থ অজ্ঞ বলা যায়।

বাল—অজ্ঞ, মূর্খ ; বাল্য—অজ্ঞতা, মূর্খতা।

৫ যাবজীবং পি চে বালো পণ্ডিতং পয়িরুপাসতি।
ন সো ধম্মং বিজানাতি দব্বী সূপরসং যথা ॥৬৪

মূর্খ যদি যাবজ্জীবনও পণ্ডিতের পর্যুপাসনা (সান্নিধ্যে অবস্থান) করে তথাপি সে ধর্মজ্ঞান লাভ করে না, যেমন দর্বী (হাতা) সূপরসের (তার মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও) স্বাদ পায় না।

৬ মুহুত্তমপি চে বিঞ্‌ঞূ পণ্ডিতং পয়িরুপাসতি।
খিপ্পং ধম্মং বিজানাতি জিব্‌হা সূপরসং যথা ॥৬৫

বিজ্ঞ যদি মুহূর্তমাত্রও পণ্ডিতের পর্যুপাসনা করে তাহলেও তিনি অচিরাৎ ধর্মজ্ঞান লাভ করেন, যেমন জিহ্বা (ক্ষণিক স্পর্শেই) সূপরসের স্বাদ পায়।

১০ মধু ব মঞ্‌ঞতি বালো যাব পাপং ন পচ্চতি।
যদা চ পচ্চতি পাপং অথ বালো দুক্‌খং নিগচ্ছতি ॥৬৯

যতদিন পাপ পক্ব (পরিপূর্ণ) না হয়, ততদিন মূর্খ তাকে মধুবৎ মনে করে ; আর পাপ যখন পাকে তখন মূর্খ দুঃখ পায়।

৬। পণ্ডিতবর্গ

৫ উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা,
উস্সুকারা নময়ন্তি তেজনং।
দারুং নময়ন্তি তচ্ছকা,
অত্তানং দময়ন্তি পণ্ডিতা ॥৮০

পূর্তকারেরা নিয়ন্ত্রিত করেন জলকে, ইষুকারেরা গঠন করেন তীরের ফলাকে, তক্ষণশিল্পীরা গঠন করেন কাঠকে, আর পণ্ডিতেরা নিয়মিত করেন নিজেকে।

নেতৃক—পূর্তকার; ইষুকার—তীরনির্মাতা; তেজন—তীরের ফলা; তক্ষক—তক্ষণশিল্পী, সূত্রধার।

৬ সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি।
এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা ॥৮১

কঠিন পর্বত যেমন বায়ুতে বিচলিত হয় না, পণ্ডিতেরাও তেমনি নিন্দাপ্রশংসাতে বিচলিত হন না। একঘন—নিরেট, কঠিন।

৭। অর্হদ্‌বর্গ

৫ যস্‌সিন্দ্রিয়ানি সমথং গতানি
অস্‌সা যথা সারথিনা সুদন্তা।
পহীনমানস্‌স অনাসবস্‌স
দেবাপি তস্‌স পিহয়ন্তি তাদিনো ॥৯৪

সারথিকর্তৃক সুসংযত অশ্বের মত যার ইন্দ্রিয়সমূহ শান্তভাব প্রাপ্ত হয়েছে, সেই নিরভিমান অনাস্রব (নিষ্কলুষ) পুরুষকে দেবতারাও স্পৃহা করেন (তদ্রূপ অবস্থা কামনা করেন)।

৮। সহস্রবর্গ

৪ যো সহস্‌সং সহস্‌সেন সংগামে মানুসে জিনে।
একং চ জেয্যমত্তানং স বে সংগামজুত্তমো ॥১০৩

যিনি সহস্র সহস্র মানুষকে সংগ্রামে জয় করেন, তাঁর চেয়ে যিনি একমাত্র নিজেকে জয় করেন তিনিই উত্তম সংগ্রামজিৎ।

১২ যো চ বস্‌সসতং জীবে দুপ্‌পঞ্‌ঞো অসমাহিতো।
একাহং জীবিতং সেয্যো পঞ্‌ঞাবন্তস্‌স ঝায়িনো ॥১১১

যে প্রজ্ঞাহীন ও অসমাহিত হয়ে শতবর্ষ জীবিত থাকে, তার জীবনের চেয়ে প্রজ্ঞাবান্‌ ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেয়ঃ।

১৩ যো চ বস্‌সসতং জীবে কুসীতো হীনবীরিয়ো।
একাহং জীবিতং সেয্যো বীরিয়মারভতো দল্‌হং ॥১১২

যে হীনবীর্য অলস (কুসীদ) শতবর্ষ জীবিত থাকে, তার (জীবনের) চেয়ে বীর্যবান্‌ দৃঢ়কর্মা (পুরুষের) এক দিনের জীবনও শ্রেয়ঃ।

৯। পাপবর্গ

৪ পাপোপি পস্‌সতি ভদ্রং যাব পাপং ন পচ্চতি।
যদা চ পচ্চতি পাপং (অথ) পাপো পাপানি পস্‌সতি ॥১১৯

যতক্ষণ পাপ পক্ক (পূর্ণ) না হয় ততক্ষণ পাপী ভদ্রই (কল্যাণই) দেখে, আর যখন পাপ পূর্ণ হয় তখন সে অকল্যাণ দেখতে পায়।

তুলনীয়:

১॥ ধম্মপদ ৫।১০

২॥ অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্‌ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥—মনু ৪।১৭৪

অধর্মের দ্বারা মানুষ আপাততঃ সমৃদ্ধ হয় এবং কল্যাণের দেখা পায়, অতঃপর শত্রুদেরও জয় করে, (কিন্তু পরিণামে) সমূলে বিনষ্ট হয়।

৫ ভদ্রো পি পস্‌সতি পাপং যাব ভদ্রং ন পচ্চতি।
যদা চ পচ্চতি ভদ্রং (অথ) ভদ্রো ভদ্রানি পস্‌সতি ॥১২০

যতক্ষণ পুণ্য পূর্ণ না হয় ততক্ষণ পুণ্যবান্‌ও অকল্যাণই দেখেন, আর পুণ্য যখন পূর্ণ হয় তখন তিনি কল্যাণ দেখতে পান।

৯ পাণিম্‌হি চে বণো নাস্‌স হরেয্য পাণিনা বিসং।
নাব্বণং বিসমন্বেতি নত্থি পাপং অকুব্বতো ॥১২৪

যদি হাতে ব্রণ (ক্ষত) না থাকে, তবে হাত দিয়ে বিষও গ্রহণ করা যায়। বিষ অক্ষত দেহের অনিষ্ট করে না। অকল্যাণ যে করে না, অকল্যাণও তার কাছে যায় না।

১০ দণ্ডবর্গ

১ সব্বে তসন্তি দণ্ডস্‌স সব্বে ভায়ন্তি মচ্চুনো।
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে ॥১২৯

সকলেই দণ্ডকে ভয় (ত্রাস) করে, সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে। অতএব সকলকেই আত্মোপম (নিজের মত) মনে করে কাউকেই হনন করো না, আঘাত করো না।

২ সব্বে তসন্তি দণ্ডস্‌স সব্বেসং জীবিতং পিয়ং।
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে ॥১৩০

সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবন সকলেরই প্রিয়। অতএব সকলকেই নিজের মত মনে করে কাউকেই হনন করো না, আঘাত করো না।

তুলনীয় :

১॥ আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥

—গীতা ৬।৩২

হে অর্জুন, যিনি সকলের সুখ ও দুঃখকে সমভাবে নিজের মত করে দেখেন তাঁকেই পরম যোগী বলে মনে করি।

২॥ প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ॥

—হিতোপদেশ, প্রথম ভাগ

নিজের প্রাণ নিজের কাছে যেমন প্রিয়, জীবগণেরও তেমনি প্রিয়। তাই সাধুরা নিজের মত করে জীবে দয়া করেন।

৫ মা বোচ ফরুসং কং চি বুত্তা পটিবদেয়্যু তং।
দুক্খা হি সারম্ভকথা পটিদণ্ডা ফুসেয়্যু তং॥১৩৩

কাউকেই পরুষ বাক্য বলো না; যাদের তুমি পরুষ বাক্য বলবে তারা তোমার প্রত্যুত্তরে সেরূপ বাক্যই প্রয়োগ করবে। ক্রুদ্ধ বাক্য (সংরম্ভকথা) দুঃখদায়ক, তাই ক্রুদ্ধ প্রত্যুত্তর (প্রতিদণ্ড) তোমাকেও স্পর্শ করবে।

১১। জরাবর্গ

৬ জীরন্তি বে রাজরথা সুচিত্তা,
অথো সরীরং পি জরং উপেতি।
সতং চ ধম্মো ন জরং উপেতি,
সন্তো হবে সব্‌ভি পবেদয়ন্তি॥১৫১

সুচিত্র (মনোহর) রাজরথও জীর্ণ হয়ে যায়, শরীরও জরা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সজ্জনদের ধর্ম কখনও জীর্ণ হয় না; একথা সৎপুরুষেরা সৎপুরুষদের কাছে বলে থাকেন।

৮ অনেকজাতিসংসারং সংধাবিস্‌সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং॥১৫৩

৯ গহকারক দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা ॥১৫৪

গৃহকারকের অনুসন্ধান (গবেষণা) করে করে অথচ না পেয়ে আমি বহু-জন্মপথে ধাবিত হয়েছি ; পুনঃপুনঃ জন্মানো দুঃখময়। হে গৃহকারক, এবার তোমার দেখা পেয়েছি, আর তুমি গৃহনির্মাণ করতে পারবে না। তোমার সমস্ত পার্শ্বকা (বরগা) ভগ্ন এবং গৃহকূট (গৃহশীর্ষ) বিনষ্ট (বিসংস্কৃত) হয়েছে। (আমার) বীতসংস্কার চিত্ত (এখন) তৃষ্ণাহীনতা প্রাপ্ত হয়েছে।

এই শ্লোকদুটির সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত পদ্যানুবাদও এ-স্থলে উদ্‌ধৃতিযোগ্য।

জন্মজন্মান্তর-পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ।
পুনঃপুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক, গৃহ না পারিবি রচিবারে আর ;
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,—
সংস্কারবিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়॥

—বৌদ্ধধর্ম (২য় সং, ১৯২২), পৃ ৩৫, ১৮৬

তৃষ্ণাই মানুষের পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ ও দেহধারণের হেতু ; পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ ও দেহধারণ দুঃখের হেতু ; তৃষ্ণাক্ষয় হলে পুনর্জন্ম, দেহধারণ ও দুঃখের বিলয় ঘটে, অর্থাৎ নির্বাণলাভ হয়। গৃহ—দেহ ; গৃহকারক—তৃষ্ণা। সংসার—পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ ; সংস্কার—প্রবৃত্তি ; বিসংস্কার-গত—প্রবৃত্তিহীন।

তুলনীয় : ১॥ অনেকজন্মসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।—গীতা ৬।৪৫
২॥ বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।—গীতা ৭।১৯

এই শ্লোকদুটি বৌদ্ধসাহিত্যে বিশেষ বিখ্যাত। বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধত্ব লাভের অব্যবহিত পরেই ভগবান্ বুদ্ধ এই উক্তি করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। তদনুসারে এই হচ্ছে ভগবান্ বুদ্ধের প্রথম উক্তি। তাঁর শেষ উক্তি এই—'অপ্পমাদেন সম্পাদেথ' (মহাপরিনিব্বাণসুত্ত), অপ্রমাদের দ্বারা কাজ করে যাও।

১২। আত্মবর্গ

২ অত্তানমেব পঠমং পতিরূপে নিবেসয়ে।
অথ'এ্‌এমনুসাসেয্য ন কিলিস্‌সেয্য পণ্ডিতো ॥১৫৮

প্রথমে নিজেকে কল্যাণকর্মে নিবিষ্ট করবে, পরে অন্যকে উপদেশ দেবে; এ রকম করলে পণ্ডিত ব্যক্তি ক্লেশ পাবেন না।

পতিরূপে (প্রতিরূপে)—কল্যাণকর্মে।

৩ অত্তানংচে তথা কয়িরা যথ'এ্‌এমনুসাসতি।
সুদন্তো বত দমেথ অত্তা হি কির দুদ্দমো ॥১৫৯

অন্যকে যেরূপ উপদেশ দেয়, লোকে যদি নিজেকে সেভাবে গঠন করে, তবে নিজে সংযত হয়ে পরকেও সংযত করতে পারে; কেননা, নিজেকে সংযত করা সত্যই কঠিন।

৪ অত্তা হি অত্তনো নাথো কো হি নাথো পরো সিয়া।
অত্তনা হি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং ॥১৬০

নিজেই নিজের আশ্রয়, অন্য আশ্রয় আর কে থাকতে পারে? নিজেকে সুসংযত করলেই দুর্লভ আশ্রয় পাওয়া যায়।

নাথ—প্রভু, আশ্রয়, শরণ।

৭ সুকরানি অসাধূনি অত্তনো অহিতানি চ।
যং বে হিতং চ সাধুং চ তং বে পরমদুক্করং ॥১৬৩

অসাধু কর্ম এবং নিজের অহিত সুকর; যা হিত এবং সাধু তেমন কর্ম পরম দুষ্কর।

তুলনীয়: কলাণং দুকরং।.. সুকরং হি পাপং।

—অশোকানুশাসন, পঞ্চম গিরিলিপি

কল্যাণ দুষ্কর। পাপই সুকর।

৯ অত্তনা ব কতং পাপং অত্তনা সংকিলিস্‌সতি।

অত্তনা অকতং পাপং অত্তনা ব বিসুজ্‌ঝতি।

সুদ্ধি অসুদ্ধি পচ্চত্তং নাঞ্‌ঞো অঞ্‌ঞং বিসোধয়ে॥১৬৫

লোকে নিজে পাপ করে, নিজেই ক্লেশ পায়; যে নিজে পাপ করে না, সে নিজেকেই বিশুদ্ধ করে। শুদ্ধি অশুদ্ধি দুই-ই নিজের অধীন; একে অন্যকে শুদ্ধ করতে পারে না। পচ্চত্তং—প্রত্যাত্মং, আত্মাধীন।

১০ অত্তদত্থং পরত্থেন বহুনাপি ন হাপয়ে।

অত্তদত্থমভিঞ্‌ঞায় সদত্থপসুতো সিয়া॥১৬৬

পরের বহু উপকারের জন্যও আত্মহিত ত্যাগ করবে না; আত্মহিতকে উত্তমরূপে জেনে তাতে নিবিষ্ট থাকবে।

অত্তদত্থ—আত্মার্থ, আত্মকল্যাণ; সদত্থপসুতো—সদর্থপ্রসিত; সদর্থ—আত্মার্থ; প্রসিত—নিবিষ্ট, নিরত।

১৩। লোকবর্গ

২ উত্তিট্‌ঠে নপ্পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে।

ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ॥১৬৮

ওঠ, প্রমত্ত হয়ো না; সুচরিত ধর্ম আচরণ কর। ধর্মচারী ইহলোকে ও পরলোকে সুখে থাকে।

৬ যো চ পুব্বে পমজ্জিত্বা পচ্ছা সো নপ্পমজ্জতি।

সোহমং লোকং পভাসেতি অব্‌ভা মুত্তো ব চন্দিমা॥১৭২

যে পূর্বে প্রমত্ত হয়ে পরে প্রমাদ পরিহার করে, সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই জগৎকে প্রভাসিত (আলোকিত) করে।

১৪। বুদ্ধবর্গ

৫ সব্বপাপস্‌স অকরণং কুসলস্‌স উপসম্পদা।
সচিত্তপরিয়োদপনং এতং বুদ্ধান সাসনং ॥১৮৩

সর্বপাপের অকরণ, কুশলকর্মের সম্পাদন ও স্বচিত্তপরিশোধন, এই হচ্ছে বুদ্ধগণের উপদেশ।

৮ ন কহাপণবস্‌সেন তিত্তি কামেসু বিজ্জতি।
অপ্পস্‌সাদা দুক্‌খা কামা ইতি বিঞ্‌ঞায় পণ্ডিতো ॥১৮৬

স্বর্ণমুদ্রাবর্ষণেও কামনার তৃপ্তি হয় না; কামনা অল্পস্বাদ ও দুঃখকর, একথা যিনি জানেন তিনিই পণ্ডিত।

কহাপণ—কার্ষাপণ, স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ।

১৫। সুখবর্গ

১ সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো।
বেরিনেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অবেরিনো ॥১৯৭

বৈরিগণের মধ্যে অবৈরী হয়ে আমরা সুখে জীবনযাপন করি, বৈরী মানুষের মধ্যেই আমরা বৈরিহীন হয়ে বিচরণ করি।

৫ জয়ং বেরং পসবতি দুক্‌খং সেতি পরাজিতো।
উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয়পরাজয়ং ॥২০১

জয় থেকে বৈর উৎপন্ন হয়, পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে থাকে। যিনি প্রশান্ত, তিনি জয়পরাজয় বর্জন করে সুখে থাকেন।

তুলনীয়: সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।—গীতা ২।৩৮

১৬। প্রিয়বর্গ

২ মা পিয়েহি সমাগচ্ছি অপ্পিয়েহি কুদাচনং।
পিয়ানং অদস্‌সনং দুক্‌খং অপ্পিয়ানং চ দস্‌সনং ॥২১০

প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুর প্রতি কখনও আসক্ত হয়ো না; প্রিয়ের অদর্শনে দুঃখ, অপ্রিয়ের দর্শনেও দুঃখ।

৭ কামতো জায়তী সোকো কামতো জায়তী ভয়ং।
কামতো বিপ্পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং ॥২১৫

কাম থেকে শোক জাত হয়, কাম থেকে ভয় জাত হয়। যিনি কাম থেকে বিপ্রমুক্ত তার শোক নেই, আর ভয় আসবে কোথা থেকে?

তুলনীয়: কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।—গীতা ২।৬২

১৭। ক্রোধবর্গ

২ যো বে উপ্পতিতং কোধং রথং ভন্তং ব ধারয়ে।
তমহং সারথিং ব্রূমি রস্মিগ্‌গাহো ইতরো জনো ॥২২২

যিনি ভ্রান্ত রথের ন্যায় উৎপতিত ক্রোধকে ধারণ (সংযত) করেন তাঁকে আমি (যথার্থ) সারথি বলি, অন্যরা তো লাগামধারী মাত্র।

ভন্ত—ভ্রান্ত (বিপথগামী) বা ভ্রমন্ত (ধাবমান); উৎপতিত—উত্থিত, জাগ্রত।

৩ অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং ॥২২৩

ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা, অসাধুকে সাধুতার দ্বারা, কৃপণকে দানের দ্বারা এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যের দ্বারা জয় করবে।

মহাভারতের বিদুরবাক্যেও অবিকল এই নীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধমসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্ ॥

—উদ্‌যোগপর্ব ৩৮।৭৩-৭৪

কদর্য—কৃপণ।

৮ ন চাহু ন ভবিস্‌সতি ন চেতরহি বিজ্জতি।
একন্তং নিন্দিতো পোসো একন্তং বা পসংসিতো ॥২২৮

একান্ত-নিন্দিত বা একান্ত-প্রশংসিত পুরুষ কখনও হয়নি, হবেও না, এখনও নেই।

১৪ কায়েন সংবুতা ধীরা অথো বাচায় সংবুতা।
মনসা সংবুতা ধীরা তে বে সুপরিসংবুতা ॥২৩৪

যে-সকল জ্ঞানী কায়ে সংযত, বাক্যে সংযত এবং মনে সংযত, তাঁরাই যথার্থ সুসংযত। সংবুত—সংবৃত, সংযত ; ধীর—ধীযুক্ত, জ্ঞানী।

১৮। মলবর্গ

৫ অনুপুব্বেন মেধাবী থোকথোকং খণে খণে।
কম্মারো রজতস্‌সেব নিদ্ধমে মলমত্তনো ॥২৩৯

কর্মকার যেমন রজতের মল দূর করে, মেধাবীও তেমনি ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে ও ক্ষণে ক্ষণে নিজের মল দূর করবেন।

অনুপুব্বেন—আনুপূর্বিকভাবে, একে একে, ক্রমশঃ।

৬ অয়সা ব মলং সমুট্‌ঠিতং
তদুট্‌ঠায় তমেব খাদতি।
এবং অতিধোনচারিণং
সানি কম্মানি নয়ন্তি দুগ্‌গতিং ॥২৪০

লোহা থেকে উৎপন্ন মল (মরচে) লোহাকেই খায় (জীর্ণ করে) ; ধর্মলঙ্ঘনকারীর স্বকর্মও তেমনি তাকে দুর্গতির মধ্যে নিয়ে যায়।

১৯। ধর্মস্থবর্গ

৫ ন তেন থেরো হোতি যেনস্স ফলিতং সিরো।
পরিপক্কো বয়ো তস্স মোঘজিণ্ণো তি বুচ্চতি ॥২৬০

মাথা সাদা হলেই কেউ বৃদ্ধ হয় না; তার বয়সই পরিপক্ব হয়েছে, তাকে বলা যায় বৃথাবৃদ্ধ (মোঘজীর্ণ)।

থের—স্থবির, বৃদ্ধ; ফলিত—পলিত, শুক্ল।

৬ যম্হি সচ্চং চ ধম্মো চ অহিংসা সঞ্ঞমো দমো।
স বে বন্তমলো ধীরো থেরো তি পবুচ্চতি ॥২৬১

যাঁর মধ্যে সত্য, ধর্ম, অহিংসা, সংযম ও দম আছে, সেই নির্মলচিত্ত জ্ঞানী (ধীর) পুরুষই স্থবির বলে প্রোক্ত হন।

বন্তমলো—বান্তমল, বিগতমল।

এই দুই শ্লোকের অনুরূপ কথা মহাভারতেও পাওয়া যায়।—

ন তেন স্থবিরো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
বালোঽপি যঃ প্রজানাতি তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ ॥
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তৈর্ন চ বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্ ॥

—বনপর্ব ১৩৩।১১-১২

কেবল পলিতশির হলেই স্থবির হয় না; বালক হয়েও যিনি প্রজ্ঞাবান্, দেবগণ তাঁকেই স্থবির বলে জানেন। কি বয়স (হায়ন), কি পলিত, কি বিত্ত, কি বন্ধু, কিছুতেই স্থবির হওয়া যায় না; যিনি সাঙ্গ-বেদাধ্যায়ী (অনূচান), ঋষিগণ তাঁকেই মহান্ বলে নির্দেশ করেন।

এই দ্বিতীয় শ্লোকটি শল্যপর্বেও (৫১।৪৭) পাওয়া যায়। আর প্রথম শ্লোকটি ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে পাওয়া যায় মনুসংহিতায় (২।১৫৬)। প্রথম লাইনের প্রথমে আছে 'ন তেন বৃদ্ধো ভবতি', আর দ্বিতীয় লাইনের প্রথমে 'যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানঃ'। অর্থ একই।

২০। মার্গবর্গ

৮ উট্‌ঠানকালম্‌হি অনুট্‌ঠহানো
যুবা বলী আলসিয়ং উপেতো।
সংসন্নসংকপ্পমনো কুসীতো
পঞ্‌ঞায মগ্‌গং অলসো ন বিন্দতি ॥২৮০

উত্থানের কালেও যে উত্থানহীন, যুবা এবং বলবান্ হয়েও যে আলস্য-পরায়ণ, সংকল্পে ও চিন্তায় যে অবসন্ন, সেই নির্বীর্য (কুসীদ) ও অলস ব্যক্তি প্রজ্ঞামার্গ প্রাপ্ত হয় না। উত্থান—উদ্যম।

অশোকানুশাসনেও 'উত্থান' নীতি প্রশংসিত এবং 'আলস্য' নিন্দিত হয়েছে। ষষ্ঠ গিরিলিপিতে আছে—কতব্যমতে হি মে সর্বলোকহিতং; তস চ পুন এস মূলে, উস্‌টানং চ অথসংতারণা চ। সর্বলোকহিতই আমি কর্তব্য মনে করি; কিন্তু তার মূল হচ্ছে উত্থান এবং দ্রুত কর্মসম্পাদন।

এই প্রসঙ্গে মহাভারতের একটি উক্তিও স্মরণীয়।—

উত্থানং হি নরেন্দ্রাণাং বৃহস্পতিরভাষত।
রাজধর্মস্য তন্মূলং শ্লোকাংশ্চাত্র নিবোধ মে॥
উত্থানহীনো রাজা হি বুদ্ধিমানপি নিত্যশঃ।
প্রধর্ষণীয়ঃ শত্রূণাং ভুজঙ্গ ইব নির্বিষঃ॥

—শান্তিপর্ব ৫৮।১৩,১৬

অশোকানুশাসনে আলস্য নিন্দিত হয়েছে প্রথম কলিঙ্গলিপিতে।

৯ বাচানুরক্‌খী মনসা সুসংবুতো
কায়েন চ অকুসলং ন কয়িরা।
এতে তয়ো কম্মপথে বিসোধয়ে
আরাধয়ে মগ্‌গমিসিপ্পবেদিতং ॥২৮১

বাক্যে সতর্ক ও মনে সংযত থেকো এবং কায়ের দ্বারা অকুশল করো

না। এই তিন কর্মপথকে বিশুদ্ধ রেখে ঋষিজ্ঞাপিত মার্গে বিচরণ করবে।

২১। প্রকীর্ণকবর্গ

২ পরদুক্খূপধানেন যো অত্তনো সুখমিচ্ছতি।
বেরসংসগ্গসংরট্ঠো বেরা সো ন পমুচ্চতি ॥২৯১

পরকে দুঃখ দিয়ে যে নিজের সুখ ইচ্ছা করে, সেই বৈরসংসর্গগ্রস্ত ব্যক্তি (কখনও) বৈর থেকে মুক্ত হয় না।

১৫ দূরে সন্তো পকাসেন্তি হিমবন্তো ব পব্বতো।
অসন্তেত্থ ন দিস্সন্তি রত্তিখিত্তা যথা সরা ॥৩০৪

সৎপুরুষেরা হিমবান্ পর্বতের ন্যায় দূর থেকেই প্রকাশিত হন; অসৎ ব্যক্তিরা রাত্রিতে নিক্ষিপ্ত শরের মতো অদৃশ্য থাকে।

২২। নিরয়বর্গ

৭ যং কিংচি সিথিলং কম্মং সংকিলিট্ঠং চ যং বতং।
সংকস্সরং ব্রহ্মচরিয়ং ন তং হোতি মহপ্ফলং ॥৩১২

শিথিল কর্ম, সংক্লিষ্ট ব্রত ও কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রহ্মচর্য মহৎ ফল দান করে না।

সংক্লিষ্ট--ক্লেশের সহিত সাধিত; সংকস্সরং—সংকৃচ্ছ্রং, কষ্টে কৃত।

১০ নগরং যথা পচ্চন্তং গুত্তং সন্তরবাহিরং।
এবং গোপেথ অত্তানং খণো বে মা উপচ্চগা ॥৩১৫

প্রত্যন্ত নগর যেমন অন্তরে বাহিরে সুরক্ষিত হয়, নিজেকেও তেমনি রক্ষা করবে, একটু ক্ষণও যেন উপেক্ষিত না হয়।

২৩। নাগবর্গ

১ অহং নাগো ব সংগামে চাপাতো পতিতং সরং।
অতিবাক্যং তিতিক্খিস্সং দুস্সীলো হি বহুজ্জনো ॥৩২০

সংগ্রামে হাতি (নাগ) যেমন ধনু (চাপ) থেকে নিক্ষিপ্ত শর সহ্য করে, আমিও তেমনি অতিবাক্য (দুর্বাক্য) সহ্য করব ; কেননা, (সংসারে) বহু লোকই দুঃশীল।

২ দন্তং নয়ন্তি সমিতিং দন্তং রাজাভিরুহতি।
দন্তো সেট্‌ঠো মনুস্‌সেসু যোঽতিবাক্যং তিতিক্‌খতি ॥৩২১

শান্ত হাতিকে লোকে জনসমাজে নিয়ে যায়, শান্ত হাতিতে রাজা আরোহণ করেন। যিনি অতিবাক্য সহ্য করেন সেই সংযমী পুরুষই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

দন্ত—দান্ত, (১) যাকে দমন করা হয়েছে, (২) যিনি আত্মদমন করেছেন। সমিতি—জনসমবায়, মতান্তরে সংগ্রাম।

২৪। তৃষ্ণাবর্গ

২১ সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি,
সব্বরসং ধম্মরসো জিনাতি।
সব্বরতিং ধম্মরতী জিনাতি,
তণ্‌হক্‌খয়ো সব্বদুক্‌খং জিনাতি ॥৩৫৪

ধর্মদান সব দানকে জয় করে, ধর্মরস সব রসকে জয় করে, ধর্মরতি সব রতিকে জয় করে, আর তৃষ্ণাক্ষয় সব দুঃখকে জয় করে।

জিনাতি—জয় করে, গুণে ছাড়িয়ে যায় ; (শেষ লাইনে) পরাভূত করে। রতি—প্রীতি, অনুরক্তি ; তৃষ্ণা—কামনা।

তুলনীয়:

১॥ নাস্তি এতারিসং দানং য়ারিসং ধংমদানং।
—অশোকানুশাসন, গিরিলিপি ১১

ধর্মদানের ন্যায় দান নাই। নবম গিরিলিপিতেও ঈষৎ ভিন্নরূপে এই কথাই পাওয়া যায়—ন তু এতারিসং অস্তি দানং…য়ারিসং ধংমদানং।

২॥ সবেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।—মনু ৪।২৩৩

সব দানেব মধ্যে ব্রহ্মদানই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মদান—বেদ (-শিক্ষা) -দান।

৩॥ যো চ লধে এতকেন হোতি সবতা বিজয়ে পিতিলসে সে। লধা সা পীতী হোতি ধংমবিজয়ম্হি।—অশোকানুশাসন, গিবিলিপি ১৩

ধর্মেব দ্বাবা সবত্র যে বিজয় লব্ধ হয় তা প্রীতিবসময়। ধমবিজয়ে সেই প্রীতি লব্ধ হয়।

পূর্বোক্ত ধমবস ও ধমবতি উভয়েবই নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে এই অনুশাসনে। এই প্রসঙ্গে চতুদশ গিবিলিপিব 'মধুবতা' শব্দটিও স্মবণীয়। বস্তুতঃ অশোকেব অনুশাসনগুলি তাব ধমানুবক্তিবই ফল।

২৫। ভিক্ষুবর্গ

২০ অত্তনা চোদয়ত্তানং পটিমাসে অত্তমত্তনা।
সো অত্তগুত্তো সতিমা সুখং ভিক্খু বিহাহিসি॥৩৭৯

নিজেই নিজেকে প্রেবণা দাও (চালনা কব), নিজেই নিজেকে বিচাব কব। হে ভিক্ষু, আত্মত্রাতা ও স্মৃতিমান্ হয়ে তুমি সুখে বিহাব কববে।

পটিমাসে—প্রতিমৃশেৎ, বিচাব কববে, অত্তগুত্তো—আত্মগুপ্ত, আত্মবক্ষিত।

২১ অত্তা হি অত্তনো নাথো অত্তা হি অত্তনো গতি।
তস্মা সঞ্ঞমযত্তানং অস্সং ভদ্রং ব বাণিজো॥৩৮০

নিজেই নিজেব প্রভু, নিজেই নিজেব গতি, সুতবাং বণিক্ যেমন ভদ্র (ভালো, শিক্ষিত) অশ্বকে সংযত কবে, তেমনি নিজেকে সংযত কব।

তুলনীয়: আত্মবর্গেব অন্তর্গত ১৬০ সংখ্যক শ্লোক।

২৬। ব্রাহ্মণবর্গ

১১ ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো।
যম্হি সচ্চং চ ধম্মং চ সো সুখী সো চ ব্রাহ্মণো॥৩৯৩

জটার দ্বারা, গোত্রের দ্বারা বা জন্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না ; যাঁর মধ্যে সত্য ও ধর্ম বিদ্যমান তিনিই সুখী, তিনিই ব্রাহ্মণ।

১২ কিং তে জটাহি দুম্মেধ কিং তে অজিনসাটিয়া।
অব্ভন্তরং তে গহনং বাহিরং পরিমজ্জসি ॥৩৯৪

হে নির্বোধ, তোমার জটায় বা তোমার অজিনবাসে (মৃগচর্মে) কি হবে? তোমার অভ্যন্তর গহন (কলুষময়), তুমি শুধু বাহিরকেই পরিমার্জনা করছ।

১৭ অক্কোসং বধবন্ধং চ অদুট্‌ঠো যো তিতিক্‌খতি।
খন্তীবলং বলানীকং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণ ॥৩৯৯

নিজে নির্দোষ হয়েও যিনি আক্রোশ এবং বধবন্ধনকে সহ্য করেন, ক্ষান্তিবলই যাঁর সেনাদল, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অক্কোস—আক্রোশ, গালাগালি ; বধবন্ধ—মৃত্যু এবং কারাবরোধ ; ক্ষান্তি—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা।



